Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

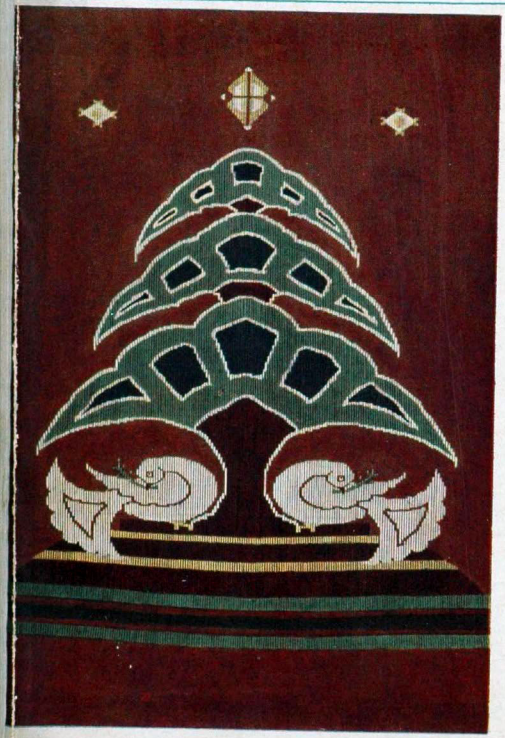

। সুভো ঠাকুরের কৃত পর্দার নক্‌সা—বোধিবৃক্ষের তলে শান্তি-পারাবত।

সম্পাদক

সুভো ঠাকুর

লেখক

বিধানচন্দ্র রায়

রাজ কৃষ্ণ

অশোক মিত্র

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়

দীনেশ দত্ত

বিশ্বনাথ চৌধুরী

আশু চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

দীপঙ্কর রায়

রামমণি

নৃপেন্দ্র সান্যাল

গোপীনাথ সেন

রঘুনাথ গোস্বামী

জেড্, এইচ, খান

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রথীন্দ্রনাথ মৈত্র

বিষ্ণু উপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রভাত রায়

মূল্য

দু টাকা

A Temple in Java, 8th century A.D.

Gunavarman

The urge to spread the teachings of the Buddha inspired the journeys of some of the greatest Indian travellers, among them Gunavarman. A prince of Kashmir, he renounced his right to the throne and travelled throughout India as a monk, reaching Ceylon in 400 A.D. Braving the rough seas in a boat he next reached Java where he was warmly welcomed by the Queen Mother. When Java was attacked by hostile forces, Gunavarman upheld the right of a nation to defend itself and, with his blessings, the King of Java led his troops to victory. Invited by the Emperor of China, Gunavarman set sail in an Indian merchant vessel and reached Nanking in 431 A.D., there to die a few months later.

An Indian boat—Bara Badur. Courtesy: Asiatic Society, Calcutta.

The hardships endured by the travellers of the past bring home to us the value of the speed and comfort of modern road travel assured by John Boyd Dunlop's invention of the pneumatic tyre.

DUNLOP

Founders of India's Tyre Industry

DC-478

তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য পুরস্কার

গত বছরের মত এই বছরেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অধিকার রাজ্যের হাতে-চালানো তাঁতশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে নগদ ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। হাতে-চালানো তাঁতশিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। নিম্নলিখিত কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে:

(ক) হাতে-চালানো তাঁতের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে নূতন ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবন

(খ) সর্বোৎকৃষ্ট তাঁতে বোনা কাপড় ও হাতে ছাপানো কাপড়

(গ) তাঁতে বোনা ও ছাপানো কাপড়ে ব্যবহার করার জন্যে কাগজে আঁকা নক্সা

(ঘ) সবচেয়ে মিহি সূতোয় সবচেয়ে ভাল জমির কাপড়

(ঙ) তাঁতে বোনা আধুনিক রুচিসম্মত নানাপ্রকার কাপড়

প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু শিল্পিগণ তাঁদের দ্রব্যাদি সহ নাম ১৯৫৭ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে স্ব স্ব জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী রেজিস্ট্রার-এর অফিসে দাখিল করবেন।

এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর শিল্প-অধিকর্তার অফিস ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ও মফঃস্বলে সহ-সমবায় নিয়ামকের অফিসে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মামুলি চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করতে পারে, এমন একখানি বাংলা বই 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক বাঙালীর পঠনযোগ্য

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে বৈদিক-হিন্দু-বৌদ্ধযুগ, পাঠান-মোগল ও বৃটিশযুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে, প্রায় দুই শত গ্রামের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সমাবেশ ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এ-বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবল পুথিনির্ভর গবেষণার গতানুগতিক ধারার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। পরিশেষে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীধরণী সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিতর্কাধীন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

—'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' নামে প্রকাশিত রচনাবলীর পরিবর্ধিত ও পুনর্বিন্যস্ত গ্রন্থরূপায়ণ—

৫৬খানি আর্টপ্লেটে প্রায় ১৫০ হাফটোন চিত্র, যা পূর্বে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়নি, বহু মানচিত্র ও রেখাচিত্রসহ, ৮১৬ পৃষ্ঠার বই, রেক্সিন বাঁধাই। মূল্য ১৮৲ টাকা।

পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগারিকরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। গ্রামাঞ্চলের ক্রেতারা স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতাকে অর্ডার দিন অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অগ্রিম মূল্য ও রেজিস্ট্রী ডাকখরচ পাঠান।

সকলের পঠনযোগ্য ও সংগ্রহযোগ্য বই

॥ পুস্তক প্রকাশক ॥ ৮১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় …

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

বিশেষ গ্রাহক বর্গের আগ্রহে

কোলে

থিন এরারুট

ও অন্যান্য **বিস্কুট**

এখন থেকে

২ নম্বর টিনেও পাওয়া যাবে

পুষ্টিকর উপাদানে খাদ্যপ্রাণে পরিপূর্ণ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ- কলিকাতা-১।

আমারনাম চা

আমার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন

চায়ের পটের মতো আমার যে-মাথাটি দেখছেন সে'টি হ'লো মৃৎশিল্পের প্রতীক। দিনে দিনে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার হচ্ছে এবং প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চায়ের পেয়ালা ও পিরিচ। মৃৎশিল্পের আয় আমাদের দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করছে।

আমার বাকী শরীর দুটিপাতা ও একটি কুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এই দু'টি পাতা ও একটি কুঁড়ি থেকে এমন একটি পানীয় তৈরি হয় যা পৃথিবীর প্রায় সকলেই সাদরে পান ক'রে থাকেন। এই সবুজ পাতা দেখে আমার জন্মস্থান সেই লক্ষ লক্ষ বিঘে বাগানের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়বে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়বে হাজার হাজার কর্মীর কথা যাঁরা এই জমি চাষ করেন। এছাড়া, কয়লা, সিমেণ্ট, সার, চা-বাগানের যন্ত্রপাতি, প্লাইউড্ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নতির মূলে রয়েছে আমারই উৎসাহ ও প্রেরণা। প্রসঙ্গতঃ বলতে পারি প্লাইউড্ থেকে আজ এই ভারতেই তৈরি হয় প্রায় ষাট লক্ষ চায়ের পেটি।

কাজেই বুঝতে পারছেন, ভারতের কৃষি ও শিল্প জীবনে আমার ভূমিকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মাঠে বা শিল্পাঞ্চলের কর্মীদের আমি বন্ধু। আর সবার উপরে, আপনার সুখ ও দুঃখের সবক'টি মুহূর্তে আমি আপনারও চিরবন্ধু।

TEA BOARD INDIA

আমারনাম চা — আমি ভারতের সম্পদ

PST 171

কাজে লাগবে কোনটা ?

আপনার ফিলিপ্স্ রেডিও একান্ত নতুন পদ্ধতিতে প্রস্তুত। এর পরিচর্যা একমাত্র ওস্তাদ কারিগর দ্বারাই সম্ভব। ফিলিপ্স্ রেডিও মেরামতের কাজে আপনার ডিলারের কারিগরই সবচেয়ে যোগ্য, কারণ মেরামতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ারপার্টস্ এঁদের কাছেই মজুত। উপরন্তু ফিলিপ্স্ রেডিও ম্যানুয়াল্ও এঁদের কাছে রয়েছে। কেনার পর গ্যারাণ্টির প্রথম বছরে যে কোন ফিলিপ্স্ ডিলার বিনামূল্যে আপনার রেডিও সার্ভিস করে দেবেন। যখনই আপনার রেডিও সারানো প্রয়োজন…

… আপনার ফিলিপ্স্ ডিলারের উপর নির্ভর করুন

ফিলিপ্স্-এর যেখানে বিক্রি সেখানেই পরিচর্যা ফিলিপ্স্ রেডিওর সুদীর্ঘ নিরুদ্বেগ আয়ু এর নির্ভরযোগ্যতার পরিচয়। নিদান অবস্থায় বারবার পরীক্ষা করা হয়। যেখানেই ফিলিপ্স্ রেডিও বিক্রি হোক না কেন, যে কোন ফিলিপ্স্ ডিলারই মেরামতের কাজে সহায়তা করবেন

PHILIPS **ফিলিপ্স্ রেডিও**

ফিলিপ্স্ ইলেকট্রিক্যাল কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

PSPH 204

"Better buy Capstan, —
"They're blended better."

CAP/309A

"শুধু ব্রাসোতেই
পিতল এত উজ্জ্বল হয়"

তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ তিনি জানেন যে পিতল ও তামার আসবাবপত্রের উপর ব্রাসোর ব্যবহার কি পরিবর্তনই না আনে। ব্রাসো শুধু উজ্জ্বলই করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহা দীঘ্র, সহজে এবং সুন্দররূপে আসবাবপত্রের ময়লা দূর করে।

তরল ও পেষ্ট

ব্রাসো

মেটাল পালিশ

আপনার গৃহের উজ্জ্বলতা বাড়ায়

PSAE 7

links
every part
of the country

INDIAN AIRLINES
CORPORATION

Hindusthan Buildings, 4, Chittaranjan Avenue, Calcutta
Telephone : 23-5141 (6 lines)

সুন্দরম্ | চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা | প্রথম বর্ষ | কার্তিক ও অগ্রহায়ণ | তেরশো তেষট্টি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
সুভো ঠাকুর

জাপানের কুটিরশিল্প ও সৌন্দর্যবোধ
বিধানচন্দ্র রায়

হস্তশিল্প ও তার নক্‌শা
রাজ কৃষ্ণ

চিত্রে প্রকাশ-শক্তি ও অলংকার
অশোক মিত্র

ললিতকলা সম্বন্ধে শ্রীনেহরু
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলায় সেকেরস্
অরণি বন্দোপাধ্যায়

শুভেচ্ছাপত্র
দীনেশ দত্ত

তাঁত ও বয়নশিল্প
বিশ্বনাথ চৌধুরী

ডুম্ভিন
আশু চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী সুনীলমাধব
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ লিখন : সত্যজিৎ রায়
অঙ্গসজ্জা : রঘুনাথ গোস্বামী
ব্লকপ্রস্তুত : এম্পায়ার হাল্‌ফটোন

নিয়মাবলী

লেখা ও লেখক সম্পর্কে। লেখক নয়, লেখাই আমাদের একমাত্র বিচার্য। খ্যাত অখ্যাত তরুণ প্রবীণ নির্বিশেষে সকলের লেখাই প্রকাশে আমরা আগ্রহশীল। শিল্পী এবং শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আমরা গ্রহণ করি।

শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কিত সচিত্র খবরাখবর পাঠাবার জন্যে আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করা হচ্ছে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

এজেন্টদের সম্পর্কে। এজেন্টদের কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। মফস্বলের সোল-এজেন্সির জন্যে পঞ্চাশ কপি নিতে হবে। অগ্রিম মূল্য ছাড়া পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের সম্পর্কে। প্রত্যেক কপি পোষ্টাল সার্টিফিকেটে পাঠানো হয়। সুতরাং কপি না পেলে পোষ্ট অফিসে খোঁজ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের পক্ষে পুনরায় কপি পাঠানো অসম্ভব।

বার্ষিক মূল্য : সডাক বারো টাকা আট আনা।
ষাণ্মাসিক মূল্য : সডাক সাত টাকা আট আনা।

পত্রিকা সম্পর্কে। বিনামূল্যে নমুনাখণ্ড দেওয়া হয় না। সাধারণ সংখ্যার জন্যে সডাক এক টাকা চার আনা এবং বিশেষ সংখ্যার জন্যে সডাক আড়াই টাকা পাঠাতে হয়। রেজিষ্ট্রিখরচ স্বতন্ত্র এক টাকা পাঠাতে হয়। বছরে দুটি যুগ্ম সংখ্যা—ভাদ্র-আশ্বিন এবং পৌষ-মাঘ—বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ-সংখ্যা দুটির প্রত্যেকটির দাম দুটাকা। ভি, পি-তে পত্রিকা পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞপ্তি **বিজ্ঞপ্তি**

বর্তমান সংখ্যা অনিবার্য কারণে যুগ্ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো। পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা না হলেও একত্রে ফাল্গুন অবধি প্রকাশিত হবে। সুন্দরমের প্রকাশকে সময়ানুগ করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও নিয়মানুযায়ী অবশ্য আমাদের বার্ষিক গ্রাহকগণ দশটি খণ্ড এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ পাঁচটি খণ্ড পাবেন।

সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ ও সমস্ত রঙিন চিত্র ছেপেছেন—আর্ট প্রেস অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ২৬৩, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কোলকাতা-১২

সূচীপত্র

শিল্পাঞ্চল টোকিয়ো
দীপঙ্কর রায়

ত্রিপুরা ভূখণ্ড ও তার অধিবাসী
রামমণি

শিল্পের রাজ্যে ত্রিপুরা
নৃপেন্দ্র সান্যাল

পূর্ব ভারতীয় আদিবাসীদের শিল্প
গোপীনাথ সেন

প্রচারশিল্পী মাখনলাল দত্তগুপ্ত
রঘুনাথ গোস্বামী

অপরাজিত
জেড এইচ খান

গুজরাটের নৃত্যনাট্য
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

প্রদর্শনী পরিক্রমা
নিজস্ব প্রতিনিধি ও রথীন্দ্র মৈত্র

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত
বিষ্ণু উপাধ্যায়

বোহেমিয়ান কাঁচ
প্রভাত রায়

খবরাখবর

এই সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্র—
সুভো ঠাকুর অঙ্কিত একটি
পর্দার নক্‌শা।

এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন

বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ কৃষ্ণ ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গবেষণা-পরামর্শদাতা। 'নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা'র পরিকল্পনা সমিতির সদস্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হস্তশিল্পের অবস্থা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার জন্য যে সমিতি গঠিত হোয়েছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।

অশোক মিত্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য। লোকশিল্প ও কলা সম্বন্ধে সারগর্ভ নানা প্রবন্ধাদির রচয়িতা। চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর বাংলায় রচিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। বাংলার জনসংখ্যার বিবরণীতে (সেন্সাস রিপোর্ট) হস্তশিল্পের এবং তার কারিগরদের সম্পর্কে তাঁর লিখিত বিভাগটি মূল্যবান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব।

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশে স্যুর-রিয়েলিস্ট ঢংয়ে ছবি এঁকে খ্যাত। সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহী।

দীনেশ দত্ত শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধকার। 'আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি'র অন্যতম সদস্য। বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বার্মা শেলের প্রচার-সচিব।

বিশ্বনাথ চৌধুরী অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিছুদিন নিজেও একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদন করেন। বাংলার লোকশিল্পের পরিসংখ্যান ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আশু চট্টোপাধ্যায় অধুনালুপ্ত 'অগ্রগতি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থকার। বহু উপন্যাস, গল্প ইত্যাদির লেখক। 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'মাসিক বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকায় লেখেন।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত তরুণ কবি। প্রাবন্ধিক। বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সর্বপ্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থ 'হালকা মেঘের মেলা'র সংকলয়িতা ও সম্পাদক। চলচ্চিত্রের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট।

দীপঙ্কর রায় যান্ত্রিক পুতুল নির্মাণে পারঙ্গম। শিল্পোৎসাহী। ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষার্থে অধুনা জাপান প্রবাসী।

রামমণি উইং কমাণ্ডার রামমণি হিসাবেই পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের আধুনিক সাহিত্যিক তথা গল্প লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অধুনা ত্রিপুরাজ্যের এস ডি ও।

নৃপেন্দ্র সান্যাল সুলেখক। গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সঙ্গে একসময় জড়িত ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

গোপীনাথ সেন শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধকার। আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ইংরেজী 'ফোক্‌লোর' পত্রিকার সম্পাদক।

রঘুনাথ গোস্বামী দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবে অল্প বয়সে সুনাম অর্জন কোরেছেন। দিল্লীর গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ নানা বিভাগে অনেকগুলি পুরস্কার পায়। সুলেখক। বর্তমানে জে ওয়াল্টার টম্‌সন নামক প্রচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রচারশিল্পী হিসেবে যুক্ত।

জেড এইচ খান চলচ্চিত্র-সমালোচক। অধুনালুপ্ত 'নিউ স্কেচ' ও সাপ্তাহিক 'ক্লোজ আপ' পত্রিকার সম্পাদক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র, সংগীত ও শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রবন্ধ-লেখক।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য 'ঝাঁসীর রাণী'-র রচয়িত্রী। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশমান উপন্যাস 'নটি' সুনাম অর্জন কোরেছে। অধুনা দক্ষিণ কোলকাতার একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

রথীন্দ্র মৈত্র শিল্পী। 'ক্যালক্যাটা গ্রুপের' প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম। অধুনা কোলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যাপক। অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের অন্যতম সম্পাদক। শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলার কলাজগতে বিশেষ স্থান অধিকার কোরেছেন।

বিষ্ণু উপাধ্যায় নৃত্য, সংগীত, চিত্র প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগী। এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বনামধন্য কবি ও প্রাবন্ধিক। 'পদাতিক', 'চিরকুট' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং 'কথার কথা', 'ভূতের বেগার' প্রভৃতি কিশোর-উপযোগী গ্রন্থ-রচয়িতা।

প্রভাত রায় সাংবাদিক ও প্রচারবিদ্। এক সময় 'লণ্ডন রয়টার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সুন্দরম্। চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ। তেরশ' তেষট্টি।

সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের "জাপানের কুটির শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ" নামক এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছে। সুভো ঠাকুর বলে—ললিতকলা, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প এবং ঐসকল বিভাগীয় শিল্পী এবং বিশেষজ্ঞদের প্রতি শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায়ের সস্নেহ দরদী হৃদয়ের পরিচয় একবার নয় একাধিকবার সাধারণভাবে ত বটেই, এমনকি বিশেষরূপে ব্যক্তিগতভাবেও সে পেয়েছে। উপরোক্ত প্রবন্ধে জাপানের সাথে এদেশের তুলনাকালে, দেশের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রিয় একটি তীক্ষ্ণধী সমালোচক-মানসের নিদর্শনও সর্বত্র বিরাজিত—সুন্দরম্ মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা যা উপলব্ধির দ্বারা সুনিশ্চিত লাভবান হবেন আশা করা অন্যায় হবে না।

এরপর সুভো ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিভিন্ন শিল্পীদের অঙ্কিত বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি উন্মোচনকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহেরু যে মন্তব্য করেন, তার উল্লেখ কোরে বলে, যে শ্রীযুক্ত নেহরুর বক্তব্য একমাত্র নেহরুর মতো রসজ্ঞ কলারসিকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায়, যে তাঁর নেতৃত্বে এবার অশোকের ভারতভূমি আবার কলা-কৃষ্টির সর্ববিভাগে তার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল গরিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হোতে বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরুর নজর শিল্পীসম্পর্কে যে কত সজাগ তা সহজেই বোধগম্য হয়, যখন দেখা যায়—জনৈক প্রত্যাখ্যাত নবীন শিল্পীর প্রতিভার পরিচয়ে, স্বয়ং তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জয়যুক্ত করার আর একটি সুসংবাদ! এতদ্দ্বারা বলা বাহুল্য, শিল্পীসমাজের সকলেই কেবলমাত্র আহ্লাদিতই নন, স্বল্পবিস্তর আশান্বিতও বটে। এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নেহরুর ব্যক্তিত্ব সরকারী ও বেসরকারী সকল রকম বেয়াকুফ্ইর চক্রব্যূহ অর্থাৎ কমিটি বোর্ড ইত্যাদির চক্রান্ত ভেদ কোরে অকুণ্ঠচিত্তে কত যে উর্ধ্বে উঠতে পারে তারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঘটনাটির শিরোনামা কোলকাতার স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় এভাবে প্রকাশিত হয়—

'আর্ট স্টীল্স্ এ ভিক্ট্রী'

খবরটি হচ্ছে এই—দিল্লীর অন্যতম নবীন শিল্পী শ্রীমান সতীশ গুজরাল—যিনি মেক্সিকোতে দেওয়াল-চিত্রণ শিক্ষা-লাভ করার পর কিছুদিন হোল ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁকে অধুনা দিল্লীদরবারের কোন একটি বিশেষ সভাগৃহের জন্যে কোনো এক দেশনেতার প্রতিকৃতি অঙ্কন করার একটি সরকারী আমন্ত্রণ জানানো কিনা—কমিশন করা হয়। অতঃপর তাঁর দ্বারা সেই দেশনেতার প্রতিকৃতি অঙ্কনের পরিসমাপ্তি ঘটলে, তা সরকারী বিচারকগণের সম্মুখে যথারীতি আনা হয়। কিন্তু তাঁদের কৃপায় সেটি সাদরে অমনোনীত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে মেক্সিকোর বিখ্যাত শিল্পী সেকেরসের আগমন ঘটে। এরপর শিল্পী সেকেরস কি উপায়ে কেমন কোরে শ্রীমান গুজরালের অঙ্কিত উপরোক্ত ছবিটি নজর করেন তা সঠিক জানা না থাকলেও এটুকু জানা যায় যে শ্রীমান সতীশ গুজরালের সেই ছবিটি তাঁর অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন কোরতে সক্ষম হয়। ছবিটি যে তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে নানা কলাবিষয়ক আলোচনান্তে উক্ত ছবিটি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ কোরে ছবিটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ছবিটি দেখেন এবং পুনর্বার দিল্লী দরবারের সেই বিশেষ সভাগৃহের সবিশেষ দেওয়ালে সেই চিত্রটিকে উন্মোচিত করেন।

এক্ষণে দিল্লী দরবারের 'কাজি-কমিটির' অথবা বিচারক সভার সভ্যগণ—যাঁরা উপরোক্ত ছবিটির উপর 'কাজীর-বিচার' চালিয়েছিলেন সেই সব মহামহোপাধ্যায়ের ব্যবস্থা এবং অবস্থা কি ঘটেছে তা জানাবার কৌতূহল শিল্পীবৃন্দের যদি ঘটে থাকে, তবে তা খুব অস্বাভাবিক হবে কি?

যাই হোক, পরবর্তী সংখ্যায় এই সম্বন্ধে আরও সবিশেষ খবরাখবর সুন্দরমের তরফ থেকে প্রকাশ করার বাসনা রইলো।

এবারে সুভো ঠাকুর গ্রাহক-গ্রাহিকা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের কছে সুন্দরমের এই বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের দরুণ দু-একটি নিমিত্ত নিবেদন কোরতে চায়।

সুভো ঠাকুরের মতে 'ভদ্রলোকের এককথা' অথবা 'কথার ঠিক' কথাটি বোধহয় কেন নিশ্চয়ই এযুগের জন্য তৈরী হয়নি। তাই সময়মত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি অথবা কথা দেওয়া সত্বেও এবারকার সুন্দরমের এইরূপ দেরীতে আত্মপ্রকাশের দরুণ সে মার্জনা চাইতে গিয়েও চাইল না। সুন্দরম প্রকাশ করার পরিকল্পনার সময় থেকেই আর কিছু হোক আর না হোক পত্রিকাটি যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক মাসে আত্মপ্রকাশ কোরতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে সুরু থেকেই সে সচেতন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে নির্ঘাত এই প্রত্যয় জন্মায় যে অকৃপণ হস্তে অকুণ্ঠ অর্থব্যয় এবং অক্লান্তরূপে আন্তরিক পরিশ্রম কোরেও ছাপাখানার সরাসরি মালিক না হোতে পারলে এইরূপ সময়মত কাগজ বের করার প্রতিজ্ঞা অথবা প্রতিশ্রুতি দান সবসময়ের জন্য 'কথার ঠিক' না হোয়ে 'কথার বেঠিক' হোতেই বাধ্য। তবে এর প্রতিকারের পুনঃপ্রচেষ্টায় সুন্দরমের প্রেস পরিবর্তন ঘটেছে।

এযুগে সত্যধর্ম নানা কারণে, স্বাভাবিকভাবে এত অস্বাভাবিক স্বল্পায়ু যে ক্ষণে ক্ষণে তা রূপান্তরিত অথবা খণ্ডিত হোলেও সে নিয়ে আপামর আজ নিশ্চিন্তে নির্বিকল্প উদাসীন। মানুষের চিন্তাসূত্র প্রতিমুহূর্তে যেরূপ আমূল পরিবর্তনে বিক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন তাতে ভাবনার গতি স্থিতিশীলতা ও স্থিরতার সড়ক স্বপ্নেও সন্ধান পাবে বলে সন্দেহ জাগে। চারিধারে নির্লজ্জ অসত্য ও অস্থিরতার উলঙ্গনৃত্যের তাতা-থৈথৈ। দেশ ও দ্রব্য নির্বিশেষে

পরস্বাপহরণের জন্য বাহু প্রসারণে সবাই যেন সদাই উদ্যত। ইতিমধ্যে সুচিন্তিত ও চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনার আওতায় বিশেষ কোরে পরিব্যাপ্ত আজ পশ্চিম আকাশের দিকচক্রবাল। পূর্বভূখণ্ডও তারই প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত। সুয়েজের সলিল-সড়ক খোলভরা সিমেণ্টসহ জাহাজের ভরাডুবিতে অবরুদ্ধ। সত্যই মিশর আক্রমণ যেমন অকস্মাৎ ঠিক ততোধিক আত্মঘাতী। পূর্ব-পশ্চিমের যোগসূত্র আজ পুনরায় দীর্ঘসূত্রে পরিণত। তাতে পশ্চিম পারাবার হোতে আগত জিনিষপত্রাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর প্রতিক্রিয়ায়—পত্রিকা প্রকাশনের ব্যাপারে, বিশেষ কোরে সুন্দরমের মতো সচিত্র পত্রিকা প্রকাশনের পথ আজ কণ্টকাকীর্ণ হোতে বাধ্য। সাগরপারের পশ্চিম দেশান্তর হোতে আনীত ব্লক তৈরীর প্যানক্রোম্যাটিক প্লেট, জিংক এবং কপার এই বিশ্বগোলযোগের অজুহাতে কালোবাজারীদের কবলে অকস্মাৎ যেন ডুব-সাঁতারের সহিষ্ণুতা-প্রতিযোগিতায় উঠে পড়ে লেগেছে। যার ফলাফলের প্রতিফলনের হাত হোতে বাংলাদেশে কলা-বিষয়ক অতি ক্ষুদ্র এই পত্রিকাটিও বাদ পড়তে সক্ষম হয়নি। সুন্দরমের এই বিলম্বের একমাত্র কারণ ঐ সমাজবিরোধী কালোবাজারীদের কাছে নতিস্বীকার না করা। সাধারণ সংখ্যা প্রত্যেকটি সুন্দরম্ পত্রিকার প্রকাশনী খরচ ন্যূনাধিক প্রায় চারটাকা যেখানে তার বিক্রয়মূল্য মাত্র একটাকা—উপরন্তু আছে আবার বিক্রয়ের উপর কমিশন। আর্থিক দিক দিয়ে এই সুন্দরম্ প্রকাশনের অবস্থা যে কিরূপ—তা পত্রিকাটির কাগজ, ছবি এবং প্রকাশনভঙ্গী ও তার মূল্য দেখলে সকলেরই অনুমেয়। এর উপর আর অধিক অর্থ-ক্ষতি সুন্দরম্ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সুভো ঠাকুর তাই সুন্দরম্ সম্পর্কে শুধু এই কথাটুকুই বোলতে চায় যে—সুন্দরম্ তার আত্মপরিচয় ও মর্যাদা মাথা উঁচু কোরে নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট। আশা করা যায়, এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক পাঠক-পাঠিকারা এইসব দিক চিন্তাসহকারে বিবেচনা কোরে মাসিক পত্রিকার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ এই বিলম্ব মোটেও মার্জনা না কোরে সুন্দরম্ প্রকাশন-প্রচেষ্টাকে বাঙালীর তথা নিজেদের জাতীয় একটি প্রচেষ্টা হিসেবে সর্ব উপায়ে সাহায্য কোরতে উদ্যোগী হবেন।

সুন্দরমের এবারকার প্রচ্ছদপটে বয়নশিল্পের নমুনা হিসেবে সুভো ঠাকুর কৃত পর্দার নক্শাটির যে রঙীন প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, তা একটি গূঢ় অর্থে ব্যবহৃত—ভারতের বোধিবৃক্ষের সুশীতল ছায়াই শান্তি-পারাবতের শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়!

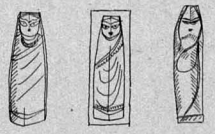

বরফে চারধার ছেয়ে গেছে।
হ্রদের জল জমে
ইস্পাতের পাতের মতো স্থির।

মনে হয় না
কোথাও স্পন্দিত হোচ্ছে প্রাণ।

। মৃত্যুর নিঃস্তব্ধতা ।

সেই আর্ত স্তব্ধতা আঁতকে উঠেছে··
কোথায় একটি পাতা
ঝরে পড়লো যেন!

শুধু সেই শব্দটুকু!
নিঃশব্দের নৈরাশ্যে
ক্ষীণতম আশার বাণীর মতো বিরাট।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে
আগত বসন্তের ছবি।

একটি স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান কবিতার অনুসরণে

ডাঃ রায় তাঁর স্টাডিতে

জাপানের কুটিরশিল্প ও সৌন্দর্যবোধ

বিধানচন্দ্র রায়

সাম্প্রতিক জাপান সফর থেকে ফিরে আসার পর, অনেকেই আমায় জাপানের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং কুটির-শিল্প সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন কোরেছেন। জাপানের কুটির-শিল্প সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা বা আমাদের দেশের কুটির-শিল্প ও জাপানের কুটির-শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মাত্র দু-একটি মোটা কথা আমি বোলতে চাই।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, যে জাপানের কুটির-শিল্পের আদর্শে বাংলাদেশে কুটির-শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যে, তা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু আমার ধারণা শুধুমাত্র জাপানী আদর্শে ব্যাপকভাবে কুটির-শিল্পের পত্তন কোরতে পারলেই যে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে

জাপানের শিল্পীরা প্রকৃতিকে বজায় রেখে, প্রকৃতির উপর কতখানি হাত চালিয়েছে উপরোক্ত চিত্রটিই তার প্রমাণ।

এই বিরাট গাছটি জাপানীদের হাতে বামন অবস্থায় পরিণত হোয়ে টেবিলের উপর একটি ছোট পাত্রে অবস্থিত হোলেও ফলন্ত।

জাপানীদের 'বন্‌সাই' শিল্পের অর্থাৎ পাত্ররক্ষিত বড় গাছের ছোট সংস্করণ হিসাবে এটি একটি আশ্চর্য নিদর্শন নয় কী?

উপরোক্ত দক্ষিণ দিকের ছবিটি জাপানের পুষ্প-সজ্জা-শিল্প অথবা 'ইকেবানা'র একটি নিখুঁত নিদর্শন।

সামান্য ছোটো একটি কাঠের জল-চৌকি, তার উপর একটি মাটির পাত্রে পাতা ও কয়েকটি ফুল সমেত ডাল নিখুঁত একটি কবিতার মতো লীলায়িত। জাপানীদের অতুলনীয় সৌন্দর্যবোধ যা কিছু তারা স্পর্শ করে তাতেই যেন প্রতিফলিত।

॥ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ

তা নয়। জাপানীরা অত্যন্ত শ্রমশীল জাতি। জাপানীদের শ্রমশীলতাকেও অনুকরণ না কোরতে পারলে কুটির-শিল্পের দ্বারা আমাদের দেশের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। জাপানীরা দৈনিক বার ঘণ্টা কোরে কাজ করে কিন্তু বাংলাদেশের লোক মাত্র ছ' ঘণ্টা কাজ কোরেই কাতর হোয়ে পড়ে। আমি স্বীকার কোরছি যে বাঙালী জাতির মস্তিষ্কশক্তির সুনাম আছে কিন্তু কোন জাতি, কেবলমাত্র মগজের পরিশ্রম দ্বারাই জগতসভায় বড় হোতে পারে না। এই পরিশ্রম-বিমুখতার জন্য হয়তো আমাদের দেশের জলবায়ু আংশিক-ভাবে দায়ী। কিন্তু জলবায়ুর প্রভাব ছাড়াও আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সমাজবিন্যাস ও শ্রমসাধ্যবৃত্তি সম্বন্ধে উন্নাসিকতা প্রভৃতি নানারকম কৃত্রিম বাধাও আমাদের শ্রমবিমুখ কোরে রেখেছে। জনশিক্ষার দিক দিয়ে জাপানীরা অনেক এগিয়ে আছে। জাপানে শতকরা পঁচানব্বইভাগ শিক্ষিত। কিন্তু শিক্ষিত হওয়া মানেই 'বাবুবৃত্তি' অবলম্বন করা একথা তারা মনে করে না। জাপান কায়মনোবাক্যে 'ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবার্' মন্ত্রের উপাসক। আমি জাপানে দেখেছি, যে লোক স্টেশনে টিকিট-কালেক্টারের কাজ করে, সেই আবার অবসর সময়ে প্ল্যাটফরম ঝাড়ু দেয় এবং বাড়ী গিয়ে চাষের কাজ করে। কাজেই জাপানের আদর্শে কুটির-শিল্পের পত্তন করার সাথে সাথে ওদের মতো দেশকে ভালোবেসে পরিশ্রম কোরতে হবে। শিল্পের মারফৎ বৈষয়িক উন্নতির মূলে রয়েছে জাপানীদের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও সৌন্দর্য-প্রিয়তা। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে বাড়ীতে ফুল সাজানো থেকে আরম্ভ কোরে মোড়ক বাঁধা পর্যন্ত সর্বত্রই ওদের এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্বাক্ষর থাকে। জাপানীজাতির সৌন্দর্য-প্রিয়তার মধ্যে বাহুল্য নেই। তাদের সব কিছুই পরিচ্ছন্ন এবং পরিমিত। এই পরিমিতিবোধ, তাদের সুন্দর বাহুল্য-বর্জিত গৃহসজ্জা থেকে আরম্ভ কোরে পণ্য-শিল্প পর্যন্ত সব কিছুতেই প্রতিফলিত। বিভিন্ন রকমের ফুল কি কোরে বিভিন্ন ও বিচিত্র কায়দায় সাজাতে হয় তা জাপানে পুরোপুরি-ভাবে শেখানো হোয়ে থাকে। জাপানী ভাষায় একে 'ইকেবানা' বলা হোয়ে থাকে। মানব-জীবনের সব কিছু তাদের হাতে শিল্পায়িত হোয়ে উঠেছে। বড় বড় জাতের গাছকে টবে পুঁতে তাকে ছোট কোরে প্রকৃতির উপর পর্যন্ত তারা কলম চালিয়েছে। জাপানের 'বোনসাই' বা

'তপস্বীর গৃহের সামনে'। হু-বুন অঙ্কিত একটি বিখ্যাত জাপানী চিত্র।

জাপানের 'ইকেবানা' বা পুষ্পশিল্পের স্বাভাবিক শিল্পগত ভারসাম্য, ছন্দ-সুষমা এবং কমনীয় মাধুর্য লক্ষণীয়।

বড় ও ছোট ও-দেশী কুল গাছের ডালপালাগুলিকে সাজানো হয়েছে।

একটি বাঁশের চোঙায় 'ইকেবানা' বা পুষ্প-শিল্পের আরেকটি নিদর্শন। সামান্য একটি বাঁশের টুকরো ও কয়েকটি ডাল সাজাতে জানলে কত সুন্দর হোতে পারে এ তারই নমুনা।

দুটি বাঁশের ডালকে কত সুন্দর কোরে কেটে একটি শিল্প-নিদর্শন কোরে তোলা যেতে পারে, এটি তারই একটি উল্লেখ্য নিদর্শন।

জাপানের চায়ের আসরে অতিথি-অভ্যাগতবৃন্দ।

'মিনিয়েচার ট্রি অন ট্রে'-শিল্প জগৎবিখ্যাত। জাপানে দোকান থেকে জিনিষ কিনলে সেই জিনিষ মোড়ক বেঁধে দেওয়ার জন্য তারা যে ফিতে ব্যবহার করে সেটির পর্যন্ত একটা বিশেষ শিল্পমূল্য আছে। ওদের দেশে কুটির-শিল্প মারফৎ যেসব পণ্য উৎপাদন হয় তা এতই রুচিপূর্ণ এবং মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে তা এতই পরিতৃপ্ত করে যে আমাদের দেশের পণ্য উৎপাদকদের পক্ষে তা অবশ্য অনুকরণীয়। প্রাচীনকালে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশও কম শিল্পবোধ ও রুচিসৌকর্যের পরিচয় দেয়নি। প্রাচীন সে সব দেশজাত শিল্প ও পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখলে আজও অদ্ভুত বিস্ময় জাগে। কিন্তু সে সব গৌরবই এখন প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত হোয়ে পড়েছে। বিদেশী শাসকরা এই দেশে এসে নিজেদের স্বার্থে সূক্ষ্ম কারিগরদের হাতের আঙুল পর্যন্ত কেটে নিয়ে উৎকৃষ্ট শিল্পগুলির সর্বনাশ সাধন কোরেছে এবং নিজেদের দেশ থেকে পণ্য আমদানী কোরে আমাদের বাজার ছেয়ে দিয়ে নানা উপায়ে দেশীয় শিল্পোৎপাদনের মূলে কুঠারাঘাত কোরেছে। বৈদেশিক শাসকবর্গের এই নিষ্ঠুর দমননীতির অপ্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই হয়তো আমাদের অলস হওয়ার আর একটি অন্যতম কারণ।

জাপানের বেশীর ভাগ শিল্পোৎপাদনে শিল্পী এবং নক্সা-শিল্পীদের অর্থাৎ ডিজাইনারদের কিছু না কিছু কাজ আছে।

আমাদের দেশেও কুটির-শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতে আর্টিষ্টদের কাজে লাগবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমার ধারণা আমাদের খুঁটিনাটি তৈজসপত্র থেকে আরম্ভ কোরে সব কিছু শিল্পোৎপাদনের কাজেই শিল্পী এবং নক্শা-শিল্পীদের বা ডিজাইনবিদ্‌দের কিছু না কিছু করার আছে। জাতীয় শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের কাজে লাগাতে পারলে আমাদের জীবনে রুচিবোধ হয়তো আবার ফিরে আসবে।

সমবায় প্রথায় পণ্য-উৎপাদনের প্রথা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চালু হয়েছে। জাপানে সমবায় প্রথা নূতন সুরু হয়েছে এবং অল্পদিন হলো সমবায়ের আইনকানুন ওদের দেশে বলবৎ হোয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের কথাও এসে পড়ে। 'কোয়ালিটি কণ্ট্রোল' জাপানে খুব সে-রকমভাবে না থাকলেও প্রত্যেক কারখানাতেই কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা আছে এবং বিশেষজ্ঞেরা বাজারে মাল ছাড়ার আগে পরীক্ষা কোরে কোয়ালিটির ছাপ মেরে দেয়।

জাপানে গিয়ে আমার এই কথাই বারংবার মনে হয়েছে যে কারিগরী নৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন কোরতে পেরেছে বলেই জাপান পণ্য-শিল্পের জগতে আজ এত বড় স্থান কোরে নিয়েছে।

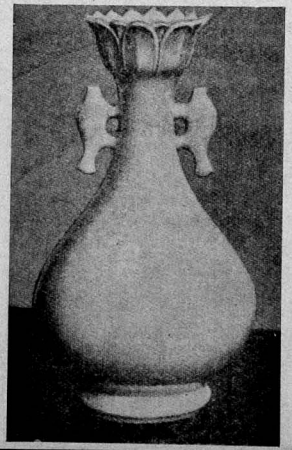

তিনটি কাণ্ডবিশিষ্ট এজো-মত্সু। একই মূল থেকে উদ্ভূত।

পদ্মাকৃতি মুখ ও মৎস্যাকৃতি হাতলবিশিষ্ট একটি শ্বেত মসৃণ 'ভাস্' বা পাত্র।

সেই দিক থেকে আমার মনে হয় আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার শিল্প-শিক্ষার এবং সৌন্দর্যবোধ জাগরূক করার বিশেষ সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প-শিক্ষা কলা-চর্চার মাধ্যমে সত্যকার সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধিতে সকল কুরুচি কদাচার এবং উশৃঙ্খলতা সমূলে উৎপাটিত হওয়া যে কত সহজ ও স্বাভাবিক জাপানই তার বিরাট দৃষ্টান্ত।

একটি সম্পূর্ণ পাইন-শাখা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। জাপানী শিল্পে পাইনের একটি বিশিষ্ট স্থান বর্তমান।

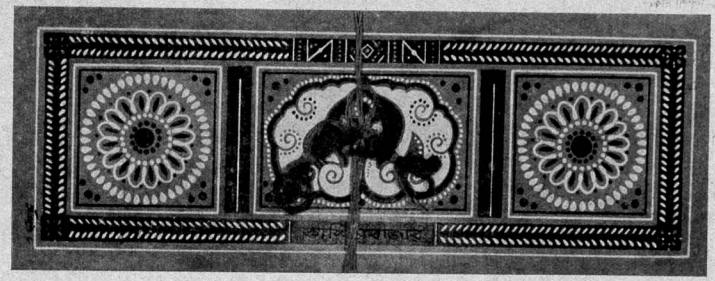

। প্রাচীনকালের পুঁথির পাটা একালের বিবাহের নিমন্ত্রণলিপিতে নবরূপ নিয়েছে।

হস্তশিল্প ও তার নক্‌শা

রাজ কৃষ্ণ

ঐতিহ্যশ্রয়ী ভারতীয় হস্তশিল্পের নক্‌শাগুলি, এ-দেশের সামাজিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিরচিত। শাসক ও অভিজাতশ্রেণীর দম্ভ ও খেয়ালখুশি এবং শিল্পীর আদি অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পোৎকর্ষের এক বিচিত্র সমন্বয় এই নক্‌শাগুলি।

দেশীয় এ-সব শিল্পকলা মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ কোরলে দেখা যাবে, প্রেরণাদায়ক সৌন্দর্য হিসাবে, অনুভবের আনন্দময়তায়, এবং বিশিষ্ট একটি ভাবমণ্ডলকে অভিব্যক্ত করার অধীরতায়—এই শিল্পকলাগুলি সার্থক। এদের পাশাপাশি দাঁড়াবার মতো আপন মহিমায় উজ্জ্বল এমন শিল্প বিশ্বের শিল্পভাণ্ডারে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু এই সম্পদ-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের সঙ্গে ক'জনেরই বা পরিচয় আছে!

হস্তশিল্প প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভালো যে, ঐতিহ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের মনে যে ভাবাবেগ আছে, শুধুমাত্র তাই সম্বল কোরে আমরা বেশিদূর অগ্রসর হোতে পারবো না। এমন কী গ্রামে, যেখানে এই ঐতিহ্যবাদ সহস্র শিকড় মেলে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও নয়, কারণ গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতা আজ নেই বোললেই চলে। কিন্তু যেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আছে, সেই সব সহরেও, এই ঐতিহ্যের প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাব। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা, শাসকবর্গ, এবং ব্যবসায়ীমহলের ঝোঁক সাধারণত সস্তা মেসিনে তৈরী দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের প্রতি। আর বোলতে কি এই ধরনের জিনিষপত্রই এখন বাজারে চলে বেশি। সেই কারণে, ঐ ধরনের বিশেষ কোন আবেদনবর্জিত আমাদের হস্তনির্মিত এই শিল্পসম্ভারের প্রতি তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা কোরতে উৎসাহিত বোধ করেন না। যদি তাঁরা রুচি ও পরিবর্তনের কথা ভেবে তা কোরতেন, তাহলে একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হতো। এই বিপ্লবের যথার্থ সংজ্ঞা যতক্ষণ না আমরা উপলব্ধি কোরতে পারছি, ততক্ষণ আমরা নক্‌শা-শিল্পকে প্রগতিমূলক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। হস্তনির্মিত এই শিল্পগুলির প্রতি কি কি কারণে আজকের ক্রেতাদের বিমুখতা, তার হদিশ পাওয়া যাবে, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা যায়। যেমন :

১। পূর্বে হস্তনির্মিত এই দ্রব্যগুলির বেশি দাম থাকা সত্ত্বেও, বিক্রি কোরতে কোনো অসুবিধা ছিল না। এখন এইটাই প্রধান অন্তরায় হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার ক্রেতাদের স্বভাবতঃই অল্পমূল্যের প্রতি আসক্তি অস্বীকার করা যায় না।

২। এখনকার ক্রেতারাও সুন্দরের মর্ম বোঝেন। কিন্তু সেটা সরল ও সহজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হোক, এইটাই তাঁরা চান।

৩। আধুনিক ক্রেতারা, সৌন্দর্য ও সৌখিনতা পছন্দ করেন, কিন্তু সাধারণত তাঁদের দৃষ্টি থাকে সেই সব জিনিষের দিকে যা আধুনিক রীতি অনুযায়ী গঠিত এবং যা খোদাইকার্য, লেখনী ইত্যাদির অঙ্কন-এর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

৪। পুরানো আমলের গাঢ় এবং জাঁকজমকপূর্ণ রঙের ব্যবহারের চেয়ে, আধুনিক ক্রেতারা, সাধারণত ছিমছাম্ রং বেশি পছন্দ করেন।

৫। পূর্বে, এই সকল হস্তশিল্পগুলি ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। আধুনিক ক্রেতারা, এখন আর সে ধরনের জিনিষ পছন্দ করেন না। এখন তাঁরা নক্‌শাগুলিকে ধর্মের প্রভাব থেকে বিমুক্ত দেখতে চান। নক্‌শার মধ্যে চিন্তার গভীরতা বা প্রতীকী অর্থের সন্ধান তাঁদের কাম্য নয়। সাধারণ মানুষের ভাব-ভাবনা এই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিফলিত হোক, এইটাই তাঁদের বাসনা।

৬। আধুনিক ক্রেতাদের টেঁকসই ও রকমারী, দ্রব্য-সম্ভারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অধিক।

৭। আধুনিক ক্রেতাদের ঐতিহ্যবাদের প্রতি যে আগ্রহ, তা নিতান্তই কৌতূহলসঞ্জাত। সুন্দর ও সৌখিনতার প্রতি তাঁদের আগ্রহ আছে, কিন্তু সেগুলি যাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই দিকেই তাঁদের লক্ষ্য থাকে। গৃহের সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে, সৌন্দর্যের প্রতি তাঁদের এই ঝোঁক মূর্ত হোয়ে ওঠে। সিগারেট কেসে, সিগারেট হোল্ডারে, টেবিল ল্যাম্পের ঢাকনায়, হলঘরের পর্দায়, উঁচু খুরওয়ালা পাদুকায়, খেলাধুলোয় বিজয়ীদের উপহৃত পতাকায়, নানান রকম নক্‌শা চিত্রিত কোরে, এই সুযোগে হস্তনির্মিত দ্রব্যসম্ভার ক্রেতাদের কাছে পৌছে দেওয়া যেতে পারে।

৮। যে দ্রব্যগুলি ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে, তাদের যে একেবারে খাঁটি, নির্ভেজাল হোতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সেগুলি যেন অধিকমূল্যের না হয়। অল্পমূল্যের বোলেই, আজ নকল অলংকারগুলি আসলের স্থান দখল কোরে নিয়েছে। এই-রকম একে একে সাদা 'প্লাস্টিক' আজ আসল আইভরির জায়গায়, সিল্কের জায়গায় 'রেয়ন' 'নাইলন' প্রভৃতি এবং আসল এনামেলের চাইতে কেমিকেল এনামেলের চাহিদা বেশি।

তথ্যবহুল এই বর্ণনা থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে, এখনকার জনসাধারণের বিভিন্নমুখী চাহিদার জোগান দিতে নক্‌শা-শিল্পী ও কারুশিল্পীদের তথা ক্রাফ্‌ট্-ডিজাইনারদের কী রকম হিম্‌সিম খেতে হয়। বস্তুত এই কাজ, চারু-শিল্পের চাইতে অনেক কঠিন। আর্টিষ্ট অথবা চারু-শিল্পী সাধারণের রুচির বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কোরে তাঁর ভাবনাকে চিত্রিত কোরতে পারেন। কিন্তু একজন ক্রাফ্‌টস্‌ম্যানকে, তার নক্‌শা বিচিত্রিত করবার পূর্বে, সাধারণের রুচিকে বোঝবার জন্য, তাদের সঙ্গে, তাদের মনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়। সেইদিক থেকে বিচার কোরে দেখলে, একজন ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানকে, একজন আর্টিষ্টের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান শুধু তো শিল্পীই নন, তাঁকে কিছুটা খরিদ্দারের মুখের দিকেও চাইতে হয়। শিল্পকে শুধুমাত্র সাজিয়ে না রেখে, কি ভাবে তা আমাদের প্রতিদিনকার কাজে লাগে, তাও তাঁদের ভাবতে হয়। ভারতীয় ক্রাফ্‌ট্‌স্-ডিজাইনাররা সাধারণের রুচি এবং প্রয়োজনের ওঠানামার দিকে সর্বদাই চেয়ে আছেন। এ ছাড়া একজন আর্টিষ্ট হিসাবে তাঁকে আধুনিক শিল্পের গতি-প্রগতি সম্বন্ধে যেমন আবার সচেতন থাকতে হয়, তেমনি সেগুলি যথার্থ ভারতীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন হোচ্ছে কি না, সে কথাও তাঁকে ভাবতে হয়। এর পরও তাঁর আরো দায়িত্ব আছে। যেমন উৎপাদন বা প্রোডাকশনের দায়িত্ব। প্রোডিউসারের কাজ সাধারণত লক্ষ্য রাখা, জিনিষগুলি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে না যায়। মেসিনে তৈরী জিনিষগুলির সাথে যেন তার তাল ঠিক থাকে। তেমনি কারুশিল্পীর নজর রাখা দরকার সেই সব উৎপাদিত জিনিষগুলির গঠনভঙ্গির দিকে।

এই শিল্পের আরো মানোন্নয়ন কোরতে হোলে, এবং জনপ্রিয় করবার বাসনা থাকলে, প্রথমত অতিরিক্ত ঐতিহ্যবাদের প্রতি আমাদের যে ঝোঁক, তা পরিত্যাগ কোরতে হবে। এখনকার বাজার বস্তুত আধুনিক রুচিসম্মত ভাবনায় আশ্রিত। এই অবস্থায়, একমাত্র ঐতিহ্যবাদকেই

আঁকড়ে থাকার অর্থ, ভারতীয় হস্তশিল্পকে মৃত্যুর পথে ত্বরান্বিত করা। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ঐতিহ্যবাদের প্রতি আমাদের যে ঝোঁক, তা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। চরম ঐতিহ্যবাদীদের বেলায় যেমন এই কথাটি প্রযোজ্য, তেমনি যারা চরম আধুনিকপন্থী, তাঁদের বেলাতেও ঐ কথাটি খাটে—যাদের ইচ্ছা, এই ভারতীয় শিল্পগুলি কল বা মেসিনে তৈরী জিনিষের মতো সস্তা হোক, মসৃণ হোক এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রূপান্তরিত হোক। তাঁদের এই ইচ্ছা ভারতীয় হস্তশিল্পের পক্ষে মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যেহেতু, এই ইচ্ছার অর্থ হস্তশিল্পকেই গলা টিপে মেরে ফেলা, তার বিলুপ্তি ঘটানো। অর্থাৎ ভারতীয় বোলে যা কিছু তাকেই বিনাশ করা।

মনে রাখা কর্তব্য যে, নকশা-শিল্পের মানোন্নয়ন কোরতে হোলে, এর পরিচালনা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। অবশ্য, নতুন পদ্ধতি ও প্যাটার্নগুলির সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের কাজ প্রকৃতপক্ষে হস্তশিল্পী এবং কারুশিল্পীদের নিজেদেরই কোরতে হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত হস্তশিল্পগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করা। এবং শিল্পীদের ও কারিগরদের কোনোরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে না রাখা। বাজারের প্রতি দৃষ্টি রেখে, কোন্‌টি গ্রহণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয়, এবং ভারতীয় হস্তশিল্পের কী ভাবে মানোন্নয়ন সম্ভব সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির উচিত আর্টিষ্ট ও ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানদের শিল্পী হিসাবে সম্মান দিয়ে তাঁদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা।

এই নক্‌শা-শিল্পোন্নয়নের কাজে, তাঁদেরই আবশ্যক, যাঁদের কারিগরি

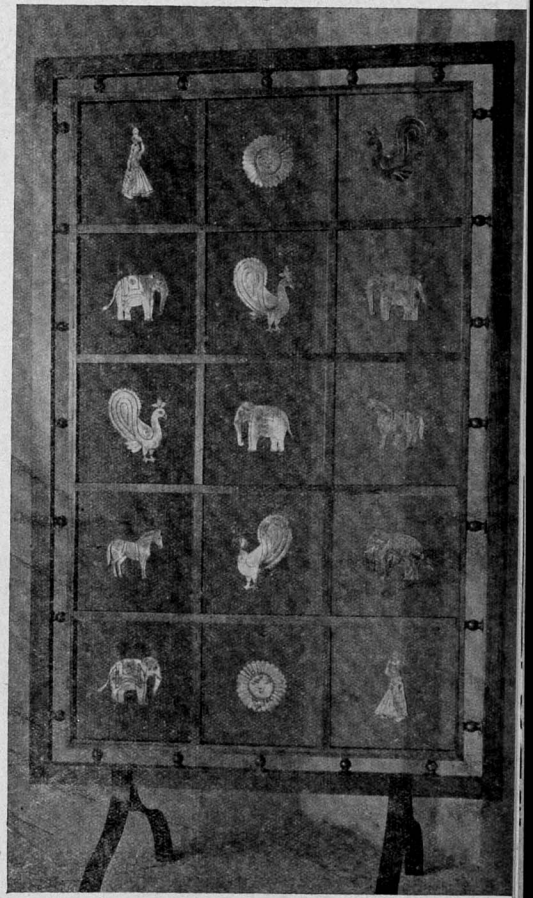

নানা পুরাতন প্রতীক-নক্‌শার সংমিশ্রণে আধুনিক একটি পার্টিশন।

বিষয়ে ঝোঁক আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা আদতে ঐতিহ্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাবান। এবং সত্বর নতুন নকশা-সৃষ্টির আনন্দে যাঁরা নিত্য আবেগশীল। সৌভাগ্যক্রমে, সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে এবং বাইরে, এই ধরনের গুণী শিল্পীদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যদি সরকারের তরফ থেকে, ভারতীয় হস্তশিল্পের পুনর্গঠনের কাজে এই সব শিল্পীদের বিশ্বাস কোরে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে, সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন, কাজে হাত লাগাবেন। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে কলা ও শিল্প-বিদ্যালয়ের যে নক্‌শা-বিভাগ স্থাপিত হোয়েছে তার পক্ষ থেকে, ছাপার মাধ্যমে, নতুন নক্‌শা-উন্নয়নের কাজ সুরু করা হোয়েছে। এখন দেখা যাক, কতদূর কী হয়।

নকশা-শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য দেশে কয়েকটি সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় আছে। যেমন :

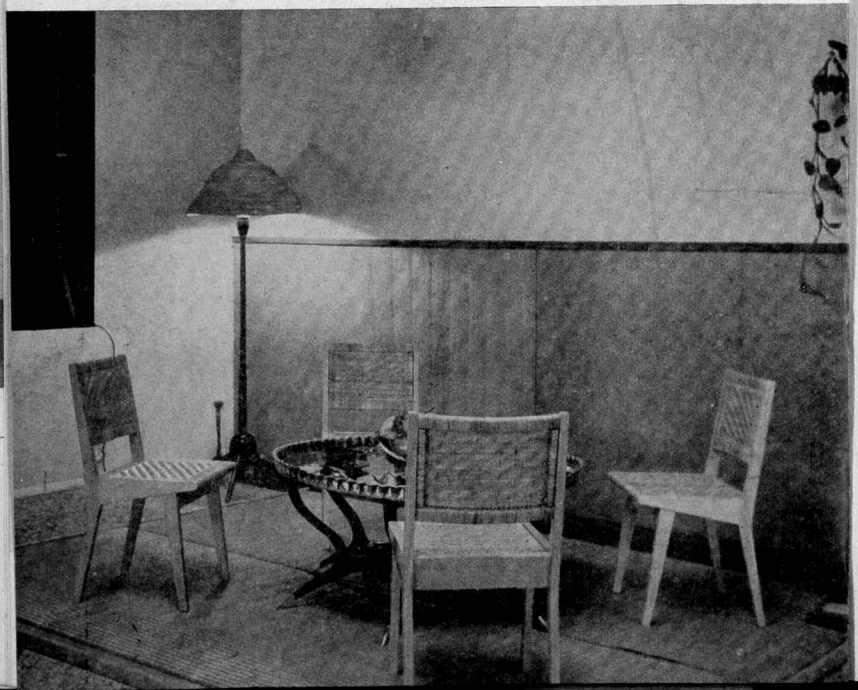

১। জে, জে, স্কুল অফ্ আর্ট, বোম্বাই।

২। গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ্ আর্ট এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, কলিকাতা।

৩। দিল্লী পলিটেক্‌নিক, দিল্লী।

৪। সেণ্ট্রাল স্কুল অফ্ আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, হায়দ্রাবাদ।

৫। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, লক্ষ্ণৌ।

৬। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, মাদ্রাজ।

নানা পুরাতন জিনিষের সম্মিলনে সজ্জিত একটি আধুনিক কক্ষ।

প্রাচীন দেওয়াল-চিত্রের অনুকরণে একটি আধুনিক সতরঞ্চির ছবি।

৭। দি মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, মাদ্রাজ।

৮। কলাক্ষেত্র, মাদ্রাজ।

৯। শ্রীচামারাজেন্দ্র টেক্‌নিকেল ইনস্‌টিটিউট্, মহীশূর।

১০। স্কুল অফ্ আর্টস্, নাগপুর।

১১। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস্, পাটনা।

১২। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্, পাঞ্জাব।

১৩। স্কুল অফ্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, জয়পুর ; রাজস্থান।

১৪। কলেজ অফ্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

১৫। কোচিন স্কুল অফ আর্টস্, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন।

১৬। মহারাজাস্ স্কুল অফ্ আর্ট, ত্রিবেন্দ্রাম্।

নিখিল ভারত হস্তশিল্পসংস্থার তরফ থেকে প্রতিটি শিল্প-বিদ্যালয়কে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হোয়েছে যে, তাঁদের বিদ্যালয়গুলিতে বাঁধা-ধরা শিক্ষাপ্রণালী ছাড়াও নক্শা উন্নয়নের জন্য যেন স্বতন্ত্র একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এই বিভাগের কাজ হবে, যেখানে বিদ্যালয়টি অবস্থিত, সেখানকার, যেগুলি পাওয়া সম্ভব, সেই সব নক্শাগুলি সংগ্রহপূর্বক যত্ন সহকারে অনুধাবন করা। যদি তা করা হয়, তাহলে নতুন নতুন নক্শা তৈরী করা সম্ভব হবে এবং সেইগুলিকে হস্তশিল্পের মাধ্যমে বাজারে চালু করা সহজ হবে।

বস্ত্র, চামড়া, কাঠের কাজ, সিরামিক, পাথর, চিনেমাটি, হাতির দাঁত, মোষের শিঙ প্রভৃতির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি নক্শা-বিভাগের (ডিজাইন সেক্শান) এক একটি পৃথক বিভাগ থাকা চাই।

নক্শা-বিভাগের পরিকল্পিত, এই নকশাগুলির উপর, সাধারণ বাজারের কোনো প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। আমাদের মনে হয়, সরকারী কেনাবেচা-প্রতিষ্ঠান ও কোনো সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্বাবধানে, স্বাভাবিক দরে, এই নক্শাগুলিকে সহজ প্রাপ্য করা উচিত।

এই নক্শা-বিভাগ এবং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য বিভাগগুলি সুপরিচালনার জন্য, এমন একজন অভিজ্ঞ শিল্পীর উপর ভার অর্পণ করা উচিত, যাঁর, এই শিল্পের অন্তর্গত, অন্তত একটি শিল্পের সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে। এবং যিনি নিজে এই সম্বন্ধে হাতে কলমে কাজ কোরেছেন। এ ছাড়া, তাঁদের নক্শা-বিভাগটির এমন একজন ওস্তাদ কারিগর থাকা দরকার উৎপাদন (প্রোডাকশন) ও নক্শা সম্পর্কে, বিশেষত ঐতিহ্যের দিক দিয়ে, যাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে। নক্শা-শিল্পের মানোন্নয়ন কোরতে হোলে, প্রাচীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারিগর, নক্শাকার ও শিক্ষিত শিল্পীদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। এই নক্শা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করবার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান কোরলে সহজেই প্রমাণ হবে যে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্য ছাড়া অন্য সব জায়গায় বাজারের যে সব প্রতিষ্ঠান হস্তশিল্প সম্পর্কে আগ্রহশীল, তাদের সঙ্গে শিল্প-বিদ্যালয়ের নির্মিত নক্শাগুলির বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। এর কারণ এই যে শিল্প-বিদ্যালয়ের এই নতুন নক্শাগুলি, যথেষ্ট ব্যবসায়িক মূল্য থাকা সত্বেও, বিক্রয়ের কোনো রকম ব্যবস্থা না কোরে শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্যই সাজিয়ে রাখা হয়। এইরকম কত যে সুন্দর সুন্দর, নতুন নতুন নক্শা, সহস্ররকম ব্যবসায়িক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও, তালাবদ্ধ প্রদর্শনী-প্রকোষ্ঠে অজ্ঞাতে অগোচরে পড়ে রয়েছে।

নক্শা-শিল্পকে আরো উন্নত কোরতে হোলে, যাঁরা হস্তশিল্পকে উৎসাহিত কোরছেন এবং যাঁরা বাজারের সঙ্গে এই জিনিষপত্রগুলিকে পরিচিত করাচ্ছেন, সেই সব হস্তশিল্প-উৎপাদনকারী ও বাজারের বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নক্শা-বিভাগের সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। নতুন নক্শাগুলি প্রস্তুত হবার পর, নক্শা বিভাগের উচিত, একটা প্রতিযোগিতামূলক দর (কম্পিটিটিভ-কস্ট্স) সহ আগ্রহশীল বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করা। এতে বাজারের মনোভাব কিছুটা জানা যাবে। এরপরে যদি দেখা যায় যে, প্রেরিত নক্শাটি বাজারে বেশ জনপ্রিয় ও চালু হোচ্ছে, তাহলে সেইটাকেই চালানো যেতে পারে।

এ ছাড়া, প্রাচীন নক্শাগুলি নিয়ে কাজ করবার এবং নতুন নক্শা পরিকল্পনার সময়, নক্শাবিভাগের উচিত মাঝে মাঝে নক্শা-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং সেগুলিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা, যাতে ছাত্র ও অন্যান্য শিল্পীরা এই সব সৃষ্টিমূলক কাজে উৎসাহিত হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অভিজ্ঞ শিল্পীদের আমন্ত্রণ কোরে আনা কর্তব্য এবং এই নক্শাগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। বিজয়ী শিল্পীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করাও আবশ্যক।

এই নক্শা-বিভাগগুলিকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হস্তশিল্প বিভাগের (অথবা সমবায়বিভাগের, যদি হস্তশিল্প সম্পর্কে এদের উপর কোনো দায়িত্ব আরোপ করা থাকে) অর্থসাহায্য করা উচিত। যদি দরকার মনে হয়, নক্শা-বিভাগের সমুদয় জিনিষপত্রের জন্য, নিখিল ভারত হস্ত-

উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দির।

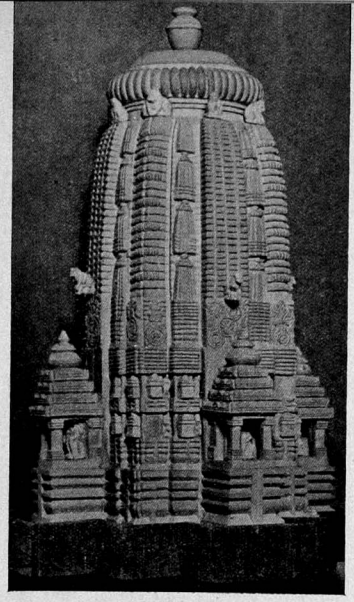

শিল্প-সংস্থার উচিত প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের প্রদান করা—এই হোচ্ছে আমাদের অভিপ্রেত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় নক্শা-শিল্প উন্নয়নের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা সুপারিশে লাভ নেই। কেননা, আমাদের ধারণা এ ধরনের সীমাবদ্ধতায় দেশের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন বিচিত্র নক্শাসমূহের অধিক উন্নয়নের কাজ বিশেষ এগোবে না। এ ছাড়া প্রায় সকল রাজ্যের কলা বিদ্যালয়গুলিতে যে নক্শাবিভাগ স্থাপন করা হোয়েছে, আমাদের মনে হয়, অন্য কোনো নূতন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা না কোরেও, তার ডিজাইন সেকশনের মারফত, নক্শা-শিল্পকে উৎসাহিত ও উন্নত করা অসম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস, হস্তদ্রব্যের জন্য নক্শা-শিল্প ক্রমশ ব্যাপক ও জনপ্রিয় হবে, যদি চারুকলার তথা ফাইন আর্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। বর্তমানে আর্ট-স্কুলসমূহেও এই সুযোগ বড় একটা নেই। যদি সম্ভব হয় তো, এই নক্শাকেন্দ্র বা ডিজাইন সেণ্টার কোনো টেক্নোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে অথবা ঐরূপ উপযুক্ত কোনো স্থান জায়গা পাওয়া গেলে, স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত এই কেন্দ্রে, নক্শা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কিছু শিক্ষককে নিয়োগ করা উচিত। এদের কাজ হবে, সহর থেকে দূরে অবস্থিত বিভিন্ন আর্ট-স্কুলগুলিতে গিয়ে শিল্প সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা। এইজন্যই বিভিন্ন নক্শা-বিভাগগুলির অন্তত একজন কোরে ভ্রাম্যমাণ নক্শাকার রাখা উচিত, যার কাজ হবে এই সব অঞ্চলগুলি নিয়মিত ভ্রমণ কোরে, পরস্পরের শিল্প-সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা। নতুন নক্শা-শিল্পের গবেষণার এবং উন্নয়নের কাজ, আমরা প্রস্তাব করি যে, ভ্রাম্যমাণ নক্শা-শিল্পীদের দ্বারা সংগঠিত হওয়া উচিত।

আর্ট-স্কুলে নক্শা-বিভাগ খোলা ছাড়াও আমরা সরকারকে 'নিখিল ভারত হস্তশিল্প-সংস্থা'র (অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্টস বোর্ড) সহযোগিতায় প্রত্যেক বৎসর একজন কম পক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নক্শা-শিল্পীকে আর্ট

এ যুগের রেফ্রিজারেটারে উড়িষ্যার মন্দির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত।

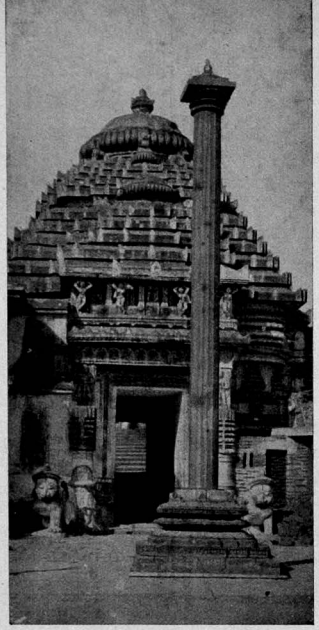

স্থলের শিক্ষণীয় শিল্পবিদ্যার (ডিজাইনিং এর উপর বিশেষ জোর দিয়ে) পুরো কোর্স শিখবার জন্য বৃত্তি দানের কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ কোরছি। এই বৃত্তির অর্থের পরিমাণ একজন সাধারণ শিল্পীর রোজগারের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয় এবং প্রত্যেক রাজ্যে পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্পবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

কারুশিল্পবিদ্যা যাঁরা শিখবেন, যদি সম্ভব হয়, তবে তাঁরা হস্তশিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য হাতে-কলমে নক্‌শার কাজ করার যেন সুযোগ পান। এই কাজ তাঁদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর ফলে তাঁদের স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তাঁরা চারুকলা 'ফাইন আর্টস্' অধিগত কোরতে অসমর্থ হোলে অন্তত 'ক্রাফ্‌ট্ ডিজাইনিং'ও বৃত্তি হিসাবে যেন অবলম্বন কোরতে পারেন। এ প্রস্তাবও ভেবে দেখা আবশ্যক বোলে বোধ হয়।

জিনিষের মূল শিল্পসৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে অঙ্কিত নক্‌শার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুনভাবে তার ব্যবহার করা নক্‌শার উন্নতির একটা দিক। সম্প্রতি নক্‌শার মাধ্যমে অনেক আপাত-পুরানো জিনিষ নতুন রূপ পেয়েছে, নতুন সৌন্দর্যে ধরা দিয়েছে শিল্পানুরাগীর চোখে। ফলে যে সমস্ত হস্তশিল্পজাত দ্রব্য পুরানো ঢঙের জন্য বাতিল হোচ্ছিল, ঠিক সুন্দরভাবে নক্‌শার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এখন তাদের চাহিদা বেড়ে গেছে। পরবর্তী তালিকা থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে :

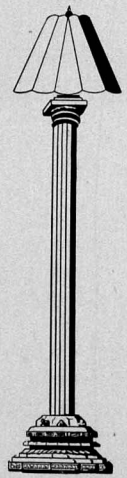

উড়িষ্যার মন্দিরের গরুড়স্তম্ভের অনুকরণে একালের একটি বৈদ্যুতিক দীপ-স্তম্ভ।

পুরোনো জিনিষ	তাদের বর্তমান রূপ	পুরোনো জিনিষ	তাদের বর্তমান রূপ
১। ক্রু-পাইনম্যাট	সুন্দর সূচীশিল্প দ্রব্য এবং টুপী, হাতব্যাগ, বেল্ট, চা-দানি ঢাকবার আবরণী।	৯। পুরীর তৈরী মন্দির-চিত্র	অভিনন্দন-পত্র ও ক্যালেণ্ডার।
২। উড়িষ্যার বয়নশিল্প পর্দা-দ্রব্য	বিদেশিনীদের ঘাঘরা (স্কার্ট), সতরঞ্চি, রুমাল।	১০। খেস-বয়নশিল্প	চাদর, গামছা ও ট্রে-র কাপড়।
৩। বেত এবং কঞ্চি (গৃহসামগ্রী ও ঝুড়ি)	বাতিদান, বাতির ঢাকনা, পাত্র, হাতব্যাগ।	১১। মাটির রেকাব	দেয়ালের অলংকরণ।
৪। তামার সৌন্দর্যদ্রব্য (মসৃণ ও মরিচা-নিরোধক)	ল্যাম্প, পাত্র, ন্যাপকিন-রিং, ছাই-দানি, জলের পাত্র, সিগারেটের বাক্স, ফলের পাত্র।		
৫। সামুদ্রিক ঝিনুক	পাত্র, বাতি, ছাইদানি, ব্রুচ এবং কানফুল।		
৬। নারকেলের মালা	তামার ধারবিশিষ্ট পাত্র, ছাইদানি।		
৭। প্রাচীন ধরনের অলঙ্কার	ছাইদানি, দরজার হাতল, পাত্র।		
৮। তালপাতার ঝুড়ি	ছোট চেয়ার, ট্রে, বাক্স কাগজফেলার ঝুড়ি ইত্যাদি।		

এ ধরনের আরো অনেক সম্ভাবনাকে সম্ভব করার কাজ নক্‌শা-উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কোরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই খাপখাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো একটি জিনিষের শৈল্পিক মূল্যের কথা ভুলে যাওয়া অনুচিত এবং কাজ করার সময় এই শিল্প-মৌলিকত্ব যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নতুনভাবে নক্‌শা করার পরে জিনিষটার মৌলিকত্বটুকুও যেন ঠিক সেই নতুনত্বে ধরা দেয়। ক্রেতা, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা যে ধরনের যে সমস্ত নক্‌শা করার কথা বলেন, নতুন নক্‌শাসমূহ সেইধরনের হোলেও হুবহু তাঁদের কল্পিত নক্‌শা হবে না। তাঁদের কল্পিত নক্‌শার সঙ্গে এই নতুন নক্‌শার যে পার্থক্য হবে, তা ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত শিল্পীর কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্যসঞ্জাত। এবং শিল্পীর কাছে আমরা সেইটাই আশা করি।

"নারীর অঙ্গে অলঙ্কারের যে স্থান, হস্তশিল্পের নক্‌শায় অলঙ্করণের স্থানও সেই একই প্রকার।"

ষ্যাস্‌ট্রেতে
সিগ্‌রেটের জলন্ত মুখ।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী
পাকিয়ে পাকিয়ে উর্দ্ধে উঠছে
—যেন স্বর্গের সিঁড়ি!

সেই সিঁড়ি বেয়ে
নেমে এলে কি তুমি?

তুলির তোলপাড়ে
রং-এর উঠলো ঝড়।
ধোঁয়ার ধরণী
ঠেকলো এসে কাগজের চড়ায়।

—চোখ মেললো কি আমার চিত্রলেখা?

ভেনেজুয়েলার একটি কবিতার ভঙ্গিতে

মিকেলাঞ্জেলো : শেষ বিচার।

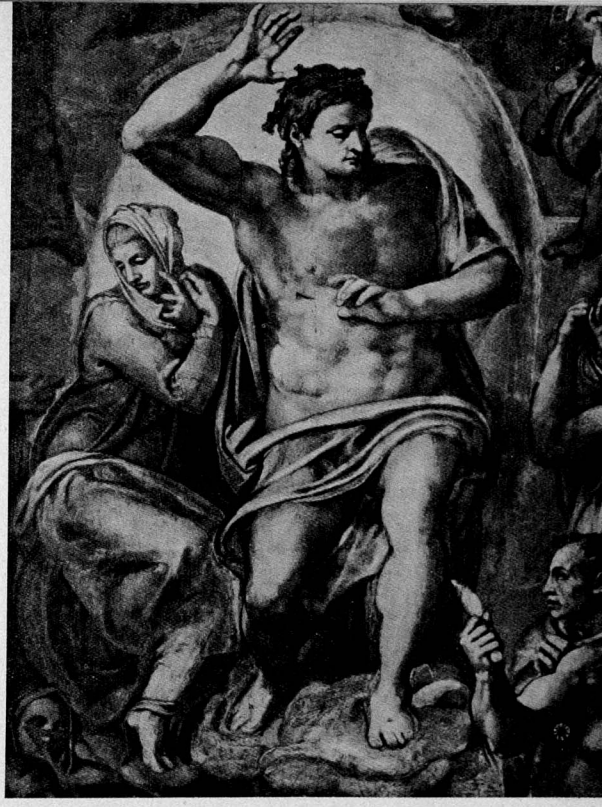

চিত্রে প্রকাশ-শক্তি ও অলংকার

অশোক মিত্র

শিল্পী আর সাধারণ লোকের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত শিল্পী যা দেখেন তা তিনি সাধারণ দশজনকে দেখাতে পারেন; দ্বিতীয়ত, এবং মুখ্যত, সাধারণ লোকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি এবং অনেক গভীরভাবে দেখতে পারেন। প্রথমটি অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষা, ক্ষমতা ও অনুশীলনের

উপর নির্ভর করে, কিন্তু সার্থক সৃষ্টির কাজে শুধু এগুলিই যথেষ্ট নয়। তার জন্য দরকার হয় এমন এক অন্তর্দৃষ্টি যার কল্যাণে শিল্পীর কাজে দেখা দেয় নতুন রূপ, আকার, ফর্ম ও শৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিকের মতো শিল্পীরও প্রধান কাজ হোচ্ছে নতুন কোরে দেখা, আবিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিক অঙ্ক এবং

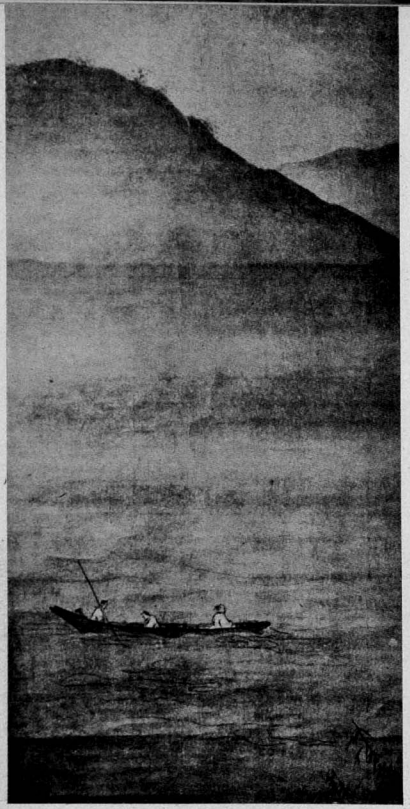

চীনে চিত্র : মায়ুয়ান যরাণা (১৩ শতক)।

সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে আবিষ্কার, গণনা, ভবিষ্যৎবাণী করেন, আর শিল্পী জাগতিক বস্তুর মধ্যে এমন গুণ আবিষ্কার করেন যার ফলে মানুষের চোখে তার মূল্য বেড়ে যায়। এই সব গুণের প্রকাশ নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের উপর, তাঁর উপায় উপকরণ, যন্ত্রপাতির উপর ; যেমন সাহিত্যের প্রকৃত বিষয় হচ্ছে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত আখ্যান, হাস্যকৌতুক অথবা শ্লেষ, বিদ্রূপ বা করুণা, ঘৃণ্য কিংবা মহৎ ঘটনার সমাবেশ। এসব কাহিনীর সার্থক বর্ণনা সাহিত্যিকই ভালো কোরে দিতে পারেন, কারণ এসব ঘটনায় যে কালক্ষেপ হয় সে কালাতিপাত সাহিত্যেই দেখানো সম্ভব। চিত্রকলায় ঘটনাপরম্পরা যদিও ভালো মতো দেখানো যায় না, তবুও চিত্রশিল্পী ছবিতে মানুষের মনের অথবা কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত ভাব সাহিত্যিকের মতই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেমন গোইয়া বা ছমিয়ে তাঁদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্লেষ, ক্লোদ ল লোরেনের ছবিতে আছে মহৎ ভাব, এল্‌গ্রেকোয় ধর্মাপ্লুত, মরমী আবেগ, রেম্‌ব্রান্টে তীব্র, মানবিক অনুভূতি। তা সত্ত্বেও ছবিতে সেই গুণ ও লক্ষণগুলিই ভালো খোলে যেগুলি চোখে দেখা যায়, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে চিত্রের নিজস্ব এলাকায় পড়ে। রঙ, রেখা, আলো, বস্তুর ঘনত্ব বা ম্যাস আমরা সোজাসুজি দেখতে পাই, তাই এই লক্ষণগুলিকেই চিত্রশিল্পী নতুন গুণে, নতুন দীপ্তিতে ভূষিত করেন। এই সব লক্ষণ বা উপাদানের উপর শিল্পী তাঁর নিজের এবং পূর্বসূরীদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়োগ করেন। সে অভিজ্ঞতা সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি ঐশ্বর্যময়। তার সাহায্যে তিনি কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ, যা কিছু মানুষকে নাড়া দেয়, তা খুঁজে বার করেন। তাদের মধ্যে এমন এক বিশিষ্ট সম্বন্ধ আনেন যার ফলে তাদের আসল সত্য রূপটি বেরিয়ে আসে। শিল্পী তাঁর কাজে যে ভাব ফুটিয়ে তোলেন, যে ব্যঞ্জনা আনেন তার মূলে থাকে এই ধরনের আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন। এই ধরনের প্রকাশ বা উদ্ঘাটনের ব্যঞ্জনা এক কথা, আর ভ্রমাত্মক, ছলনাময় নকল আরেক কথা। ছবি যদি মরীচিকার মত করে আঁকা হয়, অর্থাৎ তা দেখে প্রমাদ বা বিভ্রান্তি ঘটে, তবে তাকে বাস্তবের সত্যরূপ বলা যায় না। সার্থক প্রকাশের রূপে, ইংরেজিতে যাকে এক্সপ্রেসিভ ফর্ম বলে, তাতে সর্বদাই সত্যের অনুভূতি থাকবে।

সুতরাং রসোত্তীর্ণ চিত্র কখনই ফোটোগ্রাফ বা নথি হতে পারে না। অন্তপক্ষে তার সত্যরূপ চিনতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চারও প্রয়োজন। বিজ্ঞান কখনও দৃশ্যমান জগতের নিছক বর্ণনায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দৃশ্যমান জগতের তলায় বিজ্ঞান এমন এক জগতের সন্ধান

দেয় যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না অথচ যার সন্ধান পেলে দৃশ্যমান জগৎকে আয়ত্তে আনতে সুবিধা হয়। যাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ শিক্ষা-দীক্ষা আছে তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারেন, অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের যাচাই করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান যেমন কারোর একচেটিয়া অধিকার নয়, তেমনি তা নিয়ে যে কোন লোকের যখন তখন কথা বলারও অধিকার নেই। সেইজন্য, বিজ্ঞানের কোন জটিল সমস্যা নিয়ে কোন বুদ্ধিমান লোক না জেনেশুনে চট কোরে নিজের মত জাহির করেন না। এমন লোক বহু আছেন যাঁরা ক্যান্সার রোগ বা অ্যাটমের গড়ন সম্পর্কে কিছু না জানা থাকলে মুখ খোলেন না ; অথচ তাঁরাই আবার স্ট্রাভিন্স্কির সংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান অথবা জয়েসের উপন্যাস, কিংবা সেজান, মাতিসের ছবির বিষয়ে কিছুমাত্র না জেনে তাঁদের এককথায় নস্যাৎ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। কাজে কাজেই এ বিষয়ে আরেকটু আলোচনা দরকার।

ললিতকলায় বাস্তবের সত্যরূপ বা রিয়ালিটি কিভাবে প্রতিফলিত হয় সে আলোচনার আগে, সর্বপ্রথমে শিল্পীর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটু ধারণা হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যকে ইংরেজিতে বলে পারপাস্, অভিপ্রায়কে বলে ডিজাইন। সাধারণ ভাষায় উদ্দেশ্য বা পারপাস আর অভিপ্রায় বা ডিজাইনের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান, শিল্পের ভাষাতেও এই দু-টি কথার মধ্যে প্রায় একই ধরনের সম্পর্ক বর্তমান। ইংরেজীতে 'ডিজাইন' শব্দটির সরল অর্থ হোচ্ছে অভীপ্সা বা অভিপ্রায় ; কি উপায়ে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে কথাটিতে তারও একটু ইঙ্গিত থাকে। এমন কোন শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব নয় যাতে নাকি কোন বাস্তব ঘটনার আদ্যোপান্ত দেখাতে পারা যায় ; শিল্পী সব সময়ে এমন কতকগুলি অংশ বাছাই করে দেখান, যার মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় দুই-ই ফুটে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রধান চরিত্রের জীবনের সমস্ত কিছু বলা কোন উপন্যাসেই সম্ভব নয়, যদিই বা সম্ভব হতো তবে তা নিতান্ত অর্থহীন হতো। যে কোন উপন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিকে ফুটিয়ে তোলা ; কিন্তু সেই লক্ষণগুলি বাছাইয়ের মধ্যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বা বক্তব্য স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। অভিপ্রায় অনুসারে বাছাই করার রীতিও বদলায়। যেমন ফীল্‌ডিং, জোলা, জেমস জয়েস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে বাস্তবপন্থী বা রিয়ালিস্ট, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের রীতি আলাদা। প্রত্যেকেই বাস্তবের রূপ নিজের মতো কোরে উন্মোচন করার চেষ্টা কোরেছেন, কিন্তু

ইজিপশন ভাস্কর্য : খৃষ্টপূর্ব ২০০০–৩০০০ : ৪র্থ বংশ কেফ্‌রেন।

একের মানদণ্ড আরেকজনের উপর খাটে না। রেম্‌ব্রান্ট, ভেলাস্কেথ বা সেজান সম্বন্ধেও ঐ কথাই বোলতে হয়। উপায় উপকরণ বা টেকনিকের সঙ্গে ডিজাইনের কি সম্পর্ক সে আলোচনা পরে হবে। এখানে শুধু এইটুকু বোললেই যথেষ্ট যে বাস্তবের সত্যরূপপ্রকাশ বিচিত্রমুখী হোতে বাধ্য, কোন একটি বিশেষ ছকে বা ছাঁচে সব কিছুকে ফেলা বা ঢালা সম্ভব নয়।

বাস্তব জগতে অনেক সময়ে যে অখণ্ড, সমগ্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ আমরা পাই, আর কোন শিল্পবস্তুর রসের যে অখণ্ড ঐক্যের উল্লেখ আমরা করি (ইংরেজিতে যাকে বলে ইউনিটি অভ আর্ট), এই দুই জগতের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন আমরা কোন অখণ্ড সমগ্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাই তখন তার মধ্যে নানা ঘটনা মিলেমিশে একটি লক্ষ্যে বা পরিণামে পৌছয় বলেই তা সম্ভব হয়। এটি অবশ্য হলো মানুষের মনের কথা, অর্থাৎ জাগতিক ঘটনার মধ্যে মানুষ যে ভাবে নিজের মনে ঐক্যসূত্র খুঁজে বার করে তার কথা। কিন্তু শিল্পকলায় যেহেতু বাস্তব জীবনের সমস্ত কিছু ঘটনা শিল্পী উপস্থাপিত করতে পারেন না, সেহেতু তাঁকে বাছাই কোরে, যাতে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন অঙ্গে অখণ্ডতা আসে, ঐক্যসূত্র থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। তখন সে ঐক্যসূত্র শুধু শিল্পীর মনে থাকলে চলবে না, তাঁর সৃষ্টিতে তার ভালোরকম প্রকাশ হওয়া দরকার। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে সে ঐক্যসূত্র প্রতিভাত হওয়া দরকার। যেমন, কোন উপন্যাসে বা নাটকে কোন চরিত্র এলোমেলো অসংলগ্ন হোলে চলে না; তার সমস্ত কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায় একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যদি ফুটে না ওঠে, তাকে যে উদ্দেশ্যে উপন্যাসে বা নাটকে ঢোকানো হয়েছে সে উদ্দেশ্য যদি তার দ্বারা সাধিত না হয়, তা হলে আমরা বলি যে, সে-চরিত্রটি ওতরায়নি। শুধু যে চরিত্রটির নিজের মধ্যে সংগতি থাকলেই হলো তা নয়, উপন্যাসের

ক্লোদ মনে: ভার্ণনের কাছে সেন নদী।

পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেসকা: বেত্রাঘাত।

বা নাটকের অন্য সব ঘটনা, চরিত্র ও পরিণামের সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকা চাই, তা না হোলে বইটির সমগ্রতা খর্ব হয়। ছবিতেও একই কথা প্রযোজ্য: বাস্তবের যে সত্যরূপ সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে শিল্পী ছবি আঁকেন তার উপরে নির্ভর করে তাঁর ছবিতে কতখানি ঐক্য বা অখণ্ডতা আসবে, কতখানি প্রতীতি জন্মাবে। অর্থাৎ ছবির অভিপ্রায় বা ডিজাইনের তাগিদের উপর ছবির উৎকর্ষ নির্ভর করে; তার চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়। সুতরাং ডিজাইন অনুযায়ী যতখানি রং, ঘনত্ব বা রেখা প্রয়োজন তার কম বা বেশি হোলে হয় ছবির রিয়ালিটি ক্ষুণ্ণ হয়, নয় কোন এক দিকে ঝোঁক বেশি হোয়ে যায়; ফলে ছবির ঐক্য নষ্ট হয়, তার অখণ্ড, সমগ্র ভাবটি আর থাকে না, তখন তা কতকগুলি টুকরোর সমষ্টিমাত্র হয়।

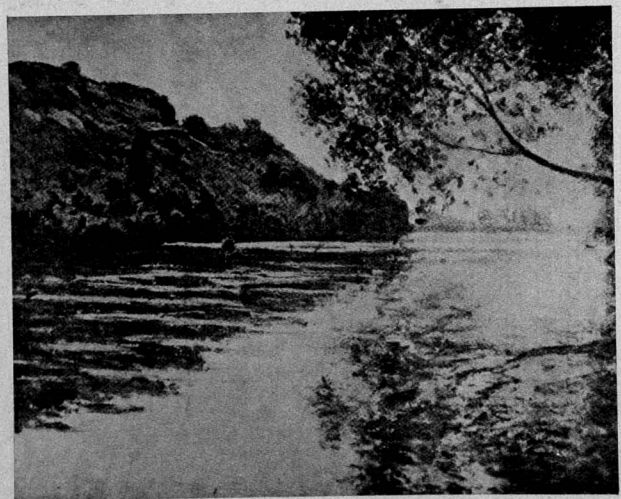

ঐক্যের সম্পূরক হোচ্ছে বৈচিত্র্য। ইউনিটি বা ঐক্য তখনই সার্থক হয় যখন বিচিত্র খুঁটিনাটির সুষ্ঠু সমন্বয় বা সংশ্লেষণ হয়, তা না হলে সে সব আয়োজন একঘেঁয়ে এবং ক্লান্তিকর হোতে বাধ্য। বাস্তব জীবনের মতো শিল্পেও এ কথাটি সমধিক সত্য। ইচ্ছা করলে নিজের জীবন থেকে অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, বাদবিসম্বাদ, ছেঁটে বাদ দেওয়া যায়; নানারকম জটিল অভিজ্ঞতা, যা জীবনে পরিপূর্ণতা আনে, সে সব থেকে ইচ্ছা কোরলে দূরে থাকা অনেক সময়ে সম্ভব। কিন্তু তার ফলে জীবন নিতান্ত একঘেঁয়ে হয়, এবং আস্তে আস্তে বুদ্ধি এবং অন্যান্য বৃত্তিগুলি শুকিয়ে মরে। সংগীতে একটি অক্টেভ বা সা থেকে সা, হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ছন্দোময়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অক্টেভে হার্মনি সম্ভব নয়, তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবকাশ এতই কম। সাহিত্যেও একই ব্যাপার। কোন চরিত্রে যদি শুধু একটিমাত্র গুণই ফুটে ওঠে, যেমন সতীত্ব, লোভ, শৌর্য অথবা ভীরুতা, তা হলে সে চরিত্র মোটেই বাস্তব হয় না, নিতান্তই ধোঁয়াটে, অবাস্তব হয়। অর্থাৎ নভেল নাটকে কোন চরিত্রের সংগতি সম্বন্ধে আমরা যখন কথা বলি তখনও তার মধ্যে একটিমাত্র লক্ষণের সংগতি থাকলে আমাদের ভাল লাগে না; নানা বিপরীত, পরস্পরবিরোধী লক্ষণে, দোষে, গুণে, যে সংগতি ফুটে উঠে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে, তাই আমাদের আকৃষ্ট করে। সংগতি মানে একই লক্ষণের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং নানা

বিচিত্র লক্ষণে ঐক্যের প্রকাশ : লক্ষ লক্ষ বালুকণার সমৈক্য নয়, বরং শরীরের নানা বিভিন্ন যন্ত্রের সুষমাবদ্ধ একজোটে কাজ। তেমনি চিত্রকলাতেও শুধু যে নানা ধরনের জিনিষ থাকলেই ছবিতে বিচিত্র ঐশ্বর্য আসে তা নয়, প্রতিটি বিষয়বস্তু চিত্রের যাবতীয় উপাদানের সার্থক প্রয়োগে গঠিত হোলেই তবে ছবির গৌরব বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ছবিতে রিয়ালিটি আনতে হোলে একঘেয়েমি যেমন বর্জনীয়, তাকে অহেতুক নানা বৈচিত্র্যের জঞ্জালে ভারাক্রান্ত করাও তেমনি অবাঞ্ছনীয়; শিল্পী যে অবস্থা বা পরিবেশ

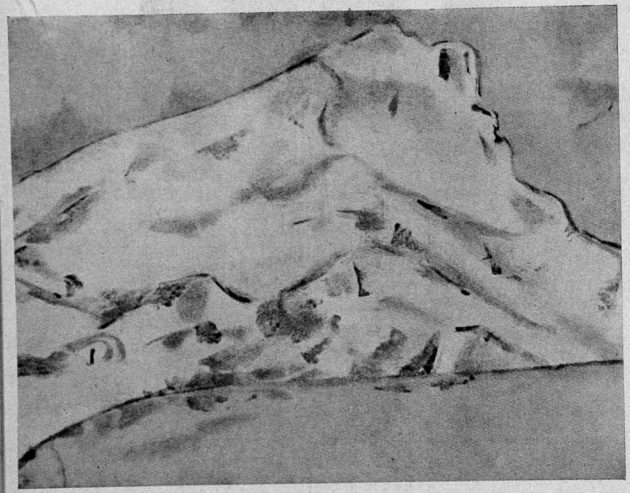

সেজান : সাঁত-ভিক্তোয়ার পাহাড়।

আঁকছেন তার বিচিত্র জটিলতা নিয়ে তার সমগ্র রূপটি তাঁর জানা দরকার, যাতে তিনি ডিজাইনটি বিচিত্র গৌরবে সম্পূর্ণ করতে পারেন।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টি শুধু কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপার নয়। তার স্বতন্ত্র জড় অস্তিত্বও আছে, সেই হিসাবে তার নিজ গুণে সুখপ্রদ হবার প্রশ্নও আসে। এই প্রসাদগুণ সমস্ত রকম শিল্প সৃষ্টিতেই কমবেশি থাকতে বাধ্য। এক কথায় এই গুণকে অলংকার বলা যায়। উপন্যাসে অলংকারগুণ সবচেয়ে কম থাকার কথা; কাব্যে এর স্থান আরও স্পষ্ট, যদিও কাব্যে শব্দের ধ্বনি আর ছন্দ এত বেশি অর্থের উপর নির্ভরশীল যে তাদের আলাদা করা যায় না। কিন্তু চিত্রকলায় রঙ ও আকার ইন্দ্রিয়ের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে, চোখের কাছে রঙ ও আকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মূল্য আছে, ফলে এই দুটি উপাদানের নিজস্ব মূল্য খুব বেশি। যে সব উপাদান উপকরণ চোখের উপর সরাসরি কাজ করে, তাদের নিজস্ব গুণাগুণের উপর অলংকারনির্ভর শিল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে ডেকরেটিভ আর্টস্, বিশেষভাবে নির্ভরশীল। দেয়ালে পটি বা ফ্রেলের কাজে, কাপড়ে বা কিংখাবে ছাপা বা ছুঁচের কাজে, গালচে, কাঁথা বা কার্পেটের কাজে, কাঠের কাজে, প্রাকৃত আকার থাকেই না, যদিই বা থাকে তা এত অপ্রাকৃত, রীতিদুরস্ত, ছকে ফেলা অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে কন্‌ভেন্‌শনালাইজড্ হয়, যে জীব বা উদ্ভিদ্‌জগতের কোন কিছু আকারের সঙ্গে তার কোন মিলই থাকে না। প্রকৃতিকে আমরা যদি নিছক মানুষের ব্যবহারের বা থাকবার জায়গা বোলে না দেখে তার নিজস্ব শোভা দেখি, তবে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নয়নাভিরাম অনেক কিছু পাবো। ফুল ফল, পাতা, মাটি, পাথর, রামধনু, সূর্যাস্ত, পাহাড়-উপত্যকার ঢেউ-খেলানো উঁচুনীচুর মধ্যে অলংকার-গুণের শেষ নেই, তাতে আমাদের সব ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হয়।

শিল্পকলাতে অলংকারের নিজস্ব স্থান ও গুণ আছে, কিন্তু অলংকারের বাহুল্য এলে শিল্পীর সৃষ্টি জ্যাবড়া হোয়ে যায়, তার সত্যগুণ অলংকারে বিড়ম্বিত হয়, তখন সেকাজ এক টুকরো কার্পেট বা নিছক গৃহসজ্জা হোয়ে পড়ে। কথাটা অবশ্য একটু অতিরঞ্জন হলো, এরকম অবস্থা বস্তুত হয় না, এমন কি সবচেয়ে অপ্রাকৃত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতেও নয়। যদিও মনে রাখতে হবে যে আধুনিক যুগে রঙীন রেখা, বিন্দু, ফোঁটা, জ্যামিতিক আকার নিয়ে যে-সব ছবি আঁকা হয় তাদের অনেকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হোচ্ছে রঙের এবং আকারের সাজন, তাদের উদ্দেশ্য দেয়ালে শোভা পাওয়া, ঘরের আকার, দেয়াল, জানলা, দরজা, আসবাব পত্রের রঙের, আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কোরে আসবাব হোয়ে থাকা। তিন মাত্রা বা ঘনত্বের আভাস কিছুটা প্রতিচ্ছবির কাজ করে, তাতে ছবির প্রকাশশক্তি বা ব্যঞ্জনাগুণ বাড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চিত্রে এই ধরনের প্রকাশশক্তি বা ব্যঞ্জনাগুণ গৌণ আসন পায়; পোর্ট্রেটে বা ল্যাণ্ডস্কেপে, বা ফিগারের গ্রুপে, প্রতিচ্ছবি বা প্রকাশ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় না হোয়ে, উপলক্ষমাত্র হয়, যাকে আশ্রয় করে রঙের হার্মনি অথবা বৈষম্য, রেখা বা আলোর প্যাটার্নের সম্ভাবনা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। মাতিসের কাজে এই রকম অলংকারের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। একই ধরনের ঝোঁক কিছুটা দেখা যায় ফরাসী প্রিমিটিভ শিল্পীদের মধ্যে। কল্পনার চেয়েও চোখের কাছে তাঁদের কাজের আদর বেশি। কারণ তাঁদের কাজে বস্তুর ঘনত্ব, গভীরত্ব, স্পেসের গভীরত্ব, বাস্তবঘেঁষা গতি, ভঙ্গী, এক কথায় প্রাকৃতিক এবং মানবিক মূল্য কম; তাদের স্থলে রঙ, রেখা, ও আকারের বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পায়, যা নাকি মনের চেয়ে চোখের কাছেই বেশি দাবী জানায়।

অনেক বড় বড় শিল্পীর কাজেও অলংকারবাহুল্য এসে যায়, তাঁরা সাজনের লোভ সামলাতে পারেন না। তাঁরা অবশ্য খুব নিপুণ কৌশলে অলংকারের অবতারণা করেন, যার ফলে সাজনে বিশিষ্টরূপ আসে, তার গরিমা বাড়ে, ছবির গঠনমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তারা সুষ্ঠুভাবে মিশে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ছবি ভালো কোরে বিশ্লেষণ করলে কাঠামোর গড়ন আর অলংকার তফাত কোরে দেখলে, দেখা যায় যে অলংকারের ভারে কাঠামো অল্পবিস্তর দুর্বল হোয়ে

দেলাক্রোয়া পিয়েতা (খৃষ্টের অবরোহণ)।

পড়েছে। বতিচেল্লির অধিকাংশ কাজ এ দোষে দুষ্ট, অর্থাৎ তাদের গড়ন একটু দুর্বল, নীরক্ত। বিখ্যাত 'বসন্তোপাখ্যান' বা 'ভিনাসের জন্ম' ছবিতে রেখা অসামান্য রকম স্বচ্ছন্দ, তরলগতি, লীলায়িত, লাবণ্যময়, বস্তু বা ফিগারের চারপাশে রেখা অবলীলাক্রমে অতি অদ্ভুতভাবে ঘুরে ঘুরে নানারকম প্যাটানের সৃষ্টি করে, তাতে রেখার লালিত্য খুবই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে যখন অন্যান্য উপাদানের খোঁজ করি, যেমন রং, আলো, ভীপ স্পেস ইত্যাদি, যার সার্থক

রুবেন্স : ক্রিমা (অংশ)।

সংশ্লেষণেই শুধু চিত্রের পুরোপুরি প্ল্যাস্টিক উৎকর্ষ সম্ভব, তখন ছবির তন্বুতাদোষ বা ঠুনকো ভাব ধরা পড়ে। অর্থাৎ তাঁর অপূর্ব দক্ষ, নিপুণ, রেখার কালোয়াতিময় অলংকারের সঙ্গে ছবির অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদান, যা সাধারণত কাঠামোয় শক্তি আনে, ভালো কোরে এক হোয়ে মেশে না; পরিণামে বত্তিচেল্লির ছবি মুখ্যত চূড়ান্ত অলংকারে পর্যবসিত হয়, মহৎ লোকাতীত শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। অলংকার ও গঠনের মধ্যে অনেক বেশি সামঞ্জস্য ও সংশ্লেষণ এনেছেন রুবেন্স; যদিচ রুবেন্সেও অনেক সময়ে অলংকার প্রাধান্য পায়। তা সত্ত্বেও রুবেন্সের ছবির তলায় অন্যান্য উপাদানের সংযোগে সচরাচর একটা শক্ত, কঠিন, ভিত্তি বা কাঠামো থাকে, যার সঙ্গে অলংকার মিশে গিয়ে, নিজের বাহুল্য হারিয়ে, ছবির প্ল্যাস্টিক মূল্য বৃদ্ধি করে।

সমস্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছবিতেই অলংকার আর ব্যঞ্জনা ওতপ্রোতভাবে একাত্ম হোয়ে যায়; শুধু যে গুণ দু-টি পরস্পর পাশাপাশি থাকে তা নয়; যে রং আর রেখা চোখকে এত আরাম দেয়, সেই রং আর রেখাই ব্যঞ্জনাময় রূপ বা এক্সপ্রেসিভ ফর্মের সৃষ্টি করে। যথা, জর্জনে, এল্‌গ্রেকো, বা রেণোয়ারের এমন কোন ছবি নেই যার কোন অংশে আঙুল দিয়ে বলা যায় সেটুকুতে ব্যঞ্জনা আছে, অলংকার নেই বা অলংকার আছে ব্যঞ্জনা নেই; প্রত্যেকটি অংশেই দু-টি গুণ সমানভাবে বর্তমান। বাস্তব জীবনে যা কিছু নিছক অলংকার তার ক্রিয়া নিতান্তই প্রসাধনের ক্রিয়া, অর্থাৎ উপরের চাকচিক্য, কস্‌মেটিক; অন্য পক্ষে যা ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে না তা নিতান্তই ঊষর, আবেগহীন, কুৎসিত, নিছক কালোয়াতি, সার্থক শিল্প নয়। যে ঐক্য এবং অখণ্ডতা রসোত্তীর্ণ হয় তাতে প্রকাশের ব্যঞ্জনা আর অলংকার দুইই থাকে; দু-টি গুণের যে কোন একটির উপর বেশি ঝোঁক বা পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকলেও, অন্যটি থাকাও একান্ত দরকার, তা না হলে তাতে বাস্তবের সত্যরূপ প্রতিফলিত হয় না। যথা, জর্জনে বা রেণোয়ারে মোটামুটি অলংকারই বেশি; অন্যদিকে রেম্‌ব্রান্ট বা সেজানে প্রকাশ-ব্যঞ্জনাই প্রধান। ফলে প্রথম দু-জনের ছবিতে লালিত্য বেশি, শেষের দুজনের চিত্রে শক্তি বেশি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই গুণের মধ্যে সমতা বজায় থাকে, কোনটাই খুব গৌণ মনে হয় না। একদিকে অন্তর্দৃষ্টি, বাহ্যরূপের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা ও শক্তি এবং অন্যদিকে অলংকারের লালিত্য: এই দু-টি গুণ শিল্পে অপরিহার্য। ক্লাসিক এবং বারোক দুই শ্রেণীর ভাস্কর্যের প্রথমটিতে গঠন ও দ্বিতীয়টিতে অলংকারের প্রাধান্য দেখা যায়। এই হিসাবে মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টি বারোক, এবং খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরের শ্রেষ্ঠ ঈজিপশান ভাস্কর্য ক্লাসিক। যথা, রোমে মিকেলাঞ্জেলোকৃত 'মোজেসের' বিখ্যাত মূর্তিতে এত বেশি অলংকারের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায় যে মূর্তিটির প্রকৃত ভাস্কর্যগত গুণ থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। অথচ লুভরে 'দ্য মর্গান' সংগ্রহে যে সব প্রাচীন ঈজিপ্‌শান মূর্তি আছে তাতে ভাস্কর্যের তিনমাত্রিক প্রয়োগে অসম্ভব ঘন ওজন, ভাস্কর্যনিহিত গুণ প্রকাশ পায়, সে ক্ষেত্রে অলংকার মোটেই ভাস্কর্যকে বিড়ম্বিত, ভারগ্রস্ত করে না। ফলে ঈজিপশান মূর্তিগুলি দেখলে মনে শুদ্ধ, নির্মল আনন্দ আসে, পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করে, কিন্তু মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যে প্রশান্তি ব্যাহত হয়, তৃপ্তি ক্ষুণ্ণ হয়, অলংকারবাহুল্যে বাহাদুরি প্রকাশের আমেজ আসে। ঠিক তেমনি আমাদের দেশে কর্ণাটক সংগীত যে পরিমাণে শুদ্ধ ও ক্লাসিক মনে হয়, উত্তরভারতীয় সঙ্গীত সেই পরিমাণে বারোক মনে হয়। তালের বাঁধনে কর্ণাটক সংগীত অত্যন্ত সংহত, শক্তিমান: তান ও মীড়ের অলংকারবাহুল্যে উত্তরভারতীয় সংগীত অনেক ক্ষেত্রেই কালোয়াতিতে ভারাক্রান্ত, যদিও দুই সংগীতের ধারাই সুন্দর।

প্রকাশ-ব্যঞ্জনা ও অলংকারের মধ্যস্থলে থাকে, শিল্পের ভাষায় যাকে বলে, আরোপিত বা স্থানান্তরিত মূল্য, ইংরেজিতে ট্র্যান্‌স্‌ফার্ড ভ্যাল্যুজ। এই বদ্‌লি মূল্যগুলি বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার গুণ নয়, সেগুলি বস্তুর উপর আরোপ কোরে শিল্পী তার গরিমা ও বৈচিত্র্য বাড়ান। ভেরমেয়ার, শারদাঁ, বা রেণোয়ারের ছবির উপরের জমির অত্যাশ্চর্য স্পর্শগ্রাহ্য গুণে যে এনামেল বা মিনে বা ভেলভেটের প্রসাদ আসে, তার সঙ্গে যে বস্তু বা শরীর আঁকা হোয়েছে তার হয়ত মিল নেই। মাতিস্ তাঁর ছবির মানুষ এমনভাবে আঁকেন যেন তাদের শরীর টালি বা চীনে মাটি দিয়ে তৈরি; ফলে শরীরে বাস্তবের আভাসের বদলে তিনি ভিন্ন কতকগুলি মূল্য আরোপ করেন। কাব্যে এর তুলামূল্য রূপ হোচ্ছে

পরোক্ষ উপমা বা উৎপ্রেক্ষা, যাতে বিষয় সম্বন্ধে যত না অন্তর্দৃষ্টি আসে তার চেয়ে বেশি থাকে শালের কাজের মতো নানা প্রতিমার জড়োয়া অলংকার, যাদের নিজস্ব, স্বতন্ত্র আবেদন থাকে, এবং তার জোরে পাঠককে আকৃষ্ট করে।

আমরা এতক্ষণ শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করেছি এক বিশেষ ধরনের দর্শন হিসাবে; শিল্পী নিজের মত করে বিশ্বজগৎকে আবিষ্কার করেন, তার পর অন্য সকলকে দেখান; সেইসঙ্গে অনুশীলনের দ্বারা দর্শকের অনুভব শক্তি কি কোরে বাড়ে, কি কি গুণ দর্শককে তৃপ্তি দেয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা কোরেছি। কিন্তু শিল্পবিচারে শিল্পীর মৌলিকতা, স্বকীয়তাও বড় কথা। অনেকেই মৌলিকতার অর্থ করেন যেন শিল্পীর কাজে অন্য কারোর কিছু প্রভাব থাকা মহা পাপ। এর চেয়ে বড় ভুল হোতে পারেনা। কারণ যা কিছু আমরা করি, বুঝি, উপভোগ করি তার পিছনে থাকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, এবং কেউ কখনও একা একা একটিমাত্র জীবনে এতখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন না। অতীত থেকে যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হোয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে যান, তাহলে তাঁর প্রচেষ্টা ততখানিই ব্যর্থ হবে যতখানি হবে তাঁর প্রয়াস যিনি নাকি কারোর সাহায্য না নিয়ে নিজের মতো কোরে অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্র আদ্যোপান্ত সৃষ্টি করতে যাবেন। অন্য লোকে যা দেখে তাঁদের দেখার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েই আমরা দেখতে শিখি, আর এই দৃষ্টি সমৃদ্ধ হয় শিল্পের বিরাট পূর্বাপর ঐতিহ্যে। যে-কোন ঐতিহ্যেরই একটি গোটা দর্শনের উপর ভিত্তি থাকে। পুরুষানুক্রমে সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিল্পীদের দৃষ্টির উপরে সে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অবিচ্ছিন্ন ভাবে, তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো তা বেড়ে চলে, সেই ঐতিহ্যই হয় মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার। ঐতিহ্যকে কেউ ব্যবহার করেন কোষাগার হিসাবে, কেউ করেন পঙ্গুর লাঠি হিসাবে। যে মুহূর্তে কোন ঐতিহ্যধারার গতিবৃদ্ধি থেমে যায়, তার প্রস্তাবশক্তি চলে গিয়ে আইন জারি করার উৎসাহ হয়, সেই মুহূর্তে তাকে জরায় ধরে, ঐতিহ্য অ্যাকাডেমিক বাঁধাবুলি আর কসরতে নেমে যায়। চিত্রশিল্পী তখনই সার্থক হন যখন তাঁর পূর্বজ বা পূর্বপুরুষদের কাজ থেকে তিনি নিজের তাগিদ, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা ডিজাইন মতো ফর্ম বাছাই কোরে নিজের কাজে লাগান, নিজের প্রয়োজন মত সে-সব বদলান, নতুন নতুন সমন্বয়ে, নতুন রূপে, ফর্মে, নিজের বক্তব্য, একান্ত নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করেন। অনুরূপ উপায়ে আবার, তাঁর দর্শক বা সমালোচক কোন চিত্রের মৌলিকত্ব, তার বিশেষ মূল্য তখনই প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করতে পারেন, যখন তিনি সেই শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন, সে ঐতিহ্যের প্রতিটি অঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত হন, এবং বুঝতে পারেন শিল্পী তাতে নতুন কি যোগ কোরে তার মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ আগে অতীতের শিল্প ভালো কোরে দেখতে শিখলে, তবে আমরা বর্তমানযুগের শিল্প ভালোভাবে দেখতে শিখি। ১৯৩৪ সালে টি-এস এলিয়ট

মানে: ক্লেমাসোঁর প্রতিকৃতি

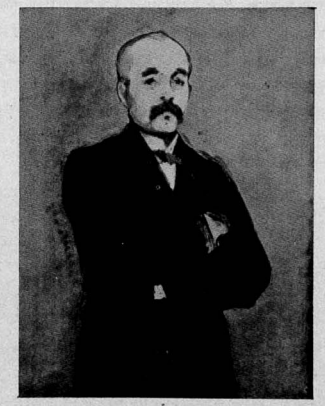

তাঁর দি 'ইউস অভ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউস অভ ক্রিটিসিজ্‌ম্' বইয়ে এ বিষয়ে খুব সুন্দর কয়েকটি কথা লেখেন। তিনি বলেন:

"পাতা যখন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তখন যদি কেউ একেকটি করে গঁদ দিয়ে সেগুলি ডালে আবার লাগিয়ে দিতে যায় তা হলে কত শক্তিই না নষ্ট হয়। ভালো জ্যান্ত গাছে আবার পাতা বেরোবে; শুকনো মরা গাছ কেটে ফেলা উচিত। কোন পুরনো ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকার সময়ে অথবা তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই

বিপদে পড়ি। যা কিছু প্রয়োজনীয় এবং প্রাণবন্ত তার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ও প্রাণহীন লক্ষণের গোলমাল হোয়ে যায়, যা কিছু সত্য এবং শাশ্বত আর যা কিছু আপতিক, এবং নিছক মমতার ব্যাপার, সে সম্বন্ধে ভেদজ্ঞান হারাই। দ্বিতীয় বিপদ হয় যখন ঐতিহ্যকে আমরা অজর, অনড় বলে ভাবি; ভাবি ঐতিহ্য সব কিছু পরিবর্তনবিরোধী; যখন পুরনো জিনিষ পুরনো ভাবেই চিরকাল জীইয়ে রাখার চেষ্টা করি, এবং তা সম্ভব ভাবি; নতুন কালে, নতুন পরিবেশে, পুরনো জিনিষ কি ভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত কোরে নতুন ভাবে বাঁচাতে হয়, তা ভাবিনা।···বর্তমান সাহিত্যকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে পড়ে সেই সব রচনা যা অতীতে যে সব কাজ চূড়ান্তভাবে হোয়ে গেছে সেগুলি ফিরেফিরতি কোরতে চায়; এই ধরনের রচনা সম্বন্ধেই 'ঐতিহ্য' কথাটি বিশেষভাবে প্রয়োগ হয়, 'অপ' প্রয়োগই হয় বলা যায়,—কারণ 'ঐতিহ্য' মানেই হোচ্ছে বহতা ধারা। ঐতিহ্য কখনও নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বোঝায় না।··বর্তমান সাহিত্যে দ্বিতীয় ধারায় পাই নতুনত্বের বাড়াবাড়ি, যে নতুনত্ব আসলে নিতান্তই অকিঞ্চিৎ, যা অসতর্ক পাঠকের কাছে তার অন্তর্নিহিত মামুলিপনা ঢেকে রাখে।···ভরাডুবি হয় তখনই যখন লেখক তাঁর নতুনত্বকে একেবারে লাগাম ছেড়ে উদ্দামগতিতে চালান, অন্যের থেকে তিনি কতখানি তফাত তাই নিয়ে লাফালাফি করেন; আর যখন পাঠকবর্গও প্রতিভা খুঁজে পান সেই লেখকেরই মধ্যে যিনি তাঁর দেশের ও জাতির সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কতখানি পায়ে ঠেলেছেন তারই জারিজুরির মধ্যে, সেই প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কতখানি নিজের সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন, তার মধ্যে নয়।···কোন সৃষ্টিকে 'আনকোরা মৌলিক' বলা মানে তাকে অল্পই প্রশংসা করা হয়; তাতে বড় জোর এইটুকু বোঝায় যে সে কাজটি হয়ত একেবারে তুচ্ছ অথবা সরাসরি অগ্রাহ্য করার নয়।"

ললিতকলা সম্বন্ধে শ্রীনেহরু

নিজস্ব প্রতিনিধি

সাধারণত দেখা যায় রাজনীতিবিদ্‌রা শিল্প ও ললিতকলা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের পরিবর্তে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, সৌভাগ্যের কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শুধু যে এর ব্যতিক্রম তাই নন, ললিতকলার মধ্যে রূপ-রস-সৌন্দর্যের যেখানেই প্রকাশ দেখতে পান তাঁর দরদী মন শিল্পীকে উৎসাহ দেবার জন্যে তখনই ব্যাকুল হোয়ে ওঠে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, বোলতে পারি, সেবার ভারত ত্যাগ করার পূর্বে দিল্লীতে আমার যে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করি, তখন কাজের ব্যস্ততায় একান্ত ভারাক্রান্ত এবং ক্লান্ত থাকা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী সপরিবারে শুধু যে সেখানে উপস্থিত হোয়েছিলেন তাই নয়, ছবি দেখতে দেখতে সেদিন তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টি—কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল, দেখেছিলুম।

বিধানসভায় নেহরু-উন্মোচিত চিত্রাবলীর অন্যতম রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি।

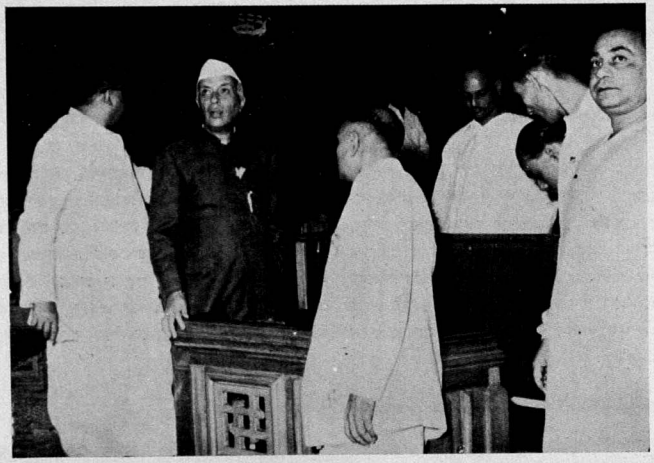

। বিধানসভায় নেতৃবৃন্দের চিত্র উন্মোচনকালে বক্তৃতারত শ্রীনেহেরু।

বুঝেছিলুম, সৌন্দর্যের নিদর্শন দেখলে তিনি কখনই সময়ের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না—বাঁধা-ধরা সময়ের প্রাচীর ভেঙে তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মন সদাই যেন শিল্পীর সঙ্গে মুক্ত আকাশে পাড়ি দিতে চায়।

—সম্পাদক সুন্দরম্।

গত ১০ই নভেম্বর বিধানসভার অভ্যন্তরে নেতৃবৃন্দের আলেখ্য উন্মোচনের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন: "ললিতকলা, প্রদর্শনীগৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। মন্দির এবং প্রাসাদের প্রাচীরে তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করা আবশ্যক, যাতে জনসাধারণের রুচি ঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে।

"সরকারী অট্টালিকাসমূহ সুন্দরভাবে সজ্জিত করার জন্যে আরও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এইসব অট্টালিকা নির্মাণের সময় বহু অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং এগুলিকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্যে আরও কিছু খরচ না করার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। এতে নবীন শিল্পীদের আরও উৎসাহ দেওয়া হবে।" শ্রীনেহেরু, মেক্সিকোর প্রখ্যাত প্রাচীরশিল্পী মিঃ সেকেরস-এর কথা উল্লেখ কোরে বলেন: "মেক্সিকোর ভাস্কর এবং প্রাচীরশিল্পীরা রাজনীতিবিদদের চেয়ে অধিক পরিচিত। এর প্রধান কারণ, এইসব শিল্পীদের সৃষ্টসম্ভার প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, বড় বড় প্রাচীরগাত্রে তা ছড়িয়ে আছে, একজন গ্রামের লোকও তা সহজে দেখতে পারে এবং উপভোগ কোরতে পারে।

"বিভিন্ন মন্দিরের প্রাচীরগাত্র থেকে প্রতিভাত হয়—যে ভারত, স্থাপত্যকলা ভাস্কর্যশিল্প ও ললিতকলায় প্রাচীনকাল থেকে ঐ ধরনের এক ঐতিহ্য বহন কোরে আসছে। এই শিল্পবিদ্যা অনুশীলন জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত কোরেছে। কিন্তু ভারত ক্রমশ এই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে এবং নানারূপ সংমিশ্রণের ফলে সংকরজাতীয় শিল্প সৃষ্ট হচ্ছে।

"আমি নবীন শিল্পীদের সেই প্রাচীন শিল্পধারা অনুশীলন কোরতে বলি।"

বৃটিশ শাসনকালীন মূর্তি এবং চিত্র বিশেষ কোরে কোলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কথা উল্লেখ কোরে শ্রীনেহেরু বলেন: "এগুলোর কি কোরে সদ্ব্যবহার করা যায় তাই এখন সমস্যা হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

"আমাদের যারা বিরোধী ছিল তাদের প্রতি অসৌজন্য দেখানোর প্রশ্ন নয়, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—আজকের ভারতকে তারা কোনো বিষয়ে প্রকাশ কোরছে না। কিন্তু এইসব মূর্তি ও চিত্র সংগ্রহের কিছু কিছু তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের চরিত্রগুলির স্মারক হিসাবে রক্ষা করা উচিত। তা বোলে এটাও ঠিক নয় যে আমাদের প্রাচীরগাত্র এবং বিস্তৃত প্রান্তরগুলো বৃটিশ শাসনের কীর্তি-স্তম্ভের ভিড়ে বোঝাই হোয়ে থাকবে।"

উন্মোচনের সময় আলেখ্যগুলির দিকে ইঙ্গিত কোরে প্রধানমন্ত্রী বলেন: "ভারতের অন্য অংশেও এই রকম আলেখ্য সংরক্ষণ করা হয়, কিন্তু বোলতে শঙ্কিত হোচ্ছি তাঁরা আলেখ্যগুলির অঙ্কনের উৎকর্ষ অথবা ভাস্কর্যের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেননি—পরিণামে কোনো কোনো স্থলে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি তাঁর গৌরব বর্ধন না কোরে চক্ষুশূল হোয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সবচেয়ে বড় কথা ভাস্কর্যবিদ্যা ও অলংকরণবিদ্যার কলাধর্মানুযায়ী মূল্য নিরূপণ আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী বলেন: "তিনি দেখে খুশী হোয়েছেন যেসব আলেখ্য তিনি উন্মোচন কোরছেন তাদের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং জাতীয় আন্দোলনে বাংলায় যাঁরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কোরে দেশের গৌরববৃদ্ধি কোরেছেন, তাঁরাও আছেন।

"বাংলাদেশের মাটিতে এইসব প্রতিভার বিকাশ হোয়েছিল। বাংলার ভাবী তরুণসম্প্রদায়ের কাছে এইসব মনীষীদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই হিসাবে এটা উপযুক্ত কাজই হোয়েছে।"

আমরা যদি জাগ্রত হই, তার সঙ্গে আমাদের শিল্প-কলাও জাগ্রত হোতে বাধ্য। সারা ভারত আজ শত শতাব্দীর তন্দ্রা থেকে জেগে উঠছে। ভারতীয় জাতি যদি অগ্রসর হয়, আমাদের শিল্প-কলাও পিছনে পড়ে থাকবে না। —নেহেরু।

সে দিন আমি সেল্‌ফ্‌-পোর্ট্রেট আঁকতে বোসে
আঁকলুম এক তোলা-উনুন।

লক্‌ড়ির লেলিহান শিখা নেই তাতে—
শুধু গন্‌গনে কয়লার আঁচ।

ভারি সুন্দর বাল্‌তির উনুন :
শিখা নেই, আঁচ আছে শুধু।
যার তাপে তৈরি হয় কত কিছু রান্না—
ডাল, ভাত, ভাতে-ভাত তরিতরকারি,
মায় মাছের মুড়িঘণ্ট ইস্তক।

এবার তর্ক বাধলো সেই উনুনের
আঙ্গিক আর শৈলী নিয়ে
—ফোক্‌আর্ট, না ফিউচারিজ্‌ম্‌?

আগুন-মাথায় তোলা-উনুন উন্মনা।
ভাত ফুটছে বুক্‌ বুক্‌···বুক্‌ বুক্‌···

ফো ক্‌ আ র্ট —না— ফি উ চা রি জ্‌ ম্‌?
···হ্যাগা! বানানটা তার বোলে দিতে পার কি?

একটি পেরুভিয়ান পদ্যের অনুকরণে

। মহৎ সৃষ্টির পশ্চাৎপটে সেকেরস।

বাংলায় সেকেরস্‌

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকে বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, শিল্পী এবং শিল্পরসিক-সমাজে, পারী সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা বেশ ব্যাপক। বছর পনেরো আগে এমন ছিল না। পারী য়ুরোপের একটি অন্যতম শিল্পকেন্দ্র, তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অসুস্থ মনের পরিচায়ক, কিন্তু এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা জানেনই না যে পারী ছাড়াও ভালো ছবি আঁকা হয়।

বিদেশী রসসৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রধানত একটি য়ুরোপীয় দেশের মাধ্যমে। কাজে কাজেই, য়ুরোপীয় রসস্রষ্টাদের প্রাধান্য দেওয়াটা অনুচিত হোলেও, খুব অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণেই মেক্সিকোর কবি বা চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অগভীর।

বিদগ্ধ ব্যক্তিরা হয়তো পাব্‌লো নেরুদার লেখা পড়েছেন, বা দিয়েগো রিবেরা অরস্‌কো, সেকেরসের ছবি দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অথচ সেইখানেই মিকেলাঞ্জেলো, পিকাসো, মাতিস্‌, বা টি, এস, এলিয়ট্‌, অডেন, শেক্‌সপীয়র প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত লোকের অভাব নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, যখন শোনা গেল যে মেক্সিকোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, দাভিদ্‌ আলফারো সেকেরস্‌ কোলকাতায় এসে আকাদমীর সালঁতে তাঁর নিজের শিল্প-জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা কোরবেন, এবং কিছু রঙিন স্লাইড্‌ দেখাবেন, তখন শোনার এবং দেখার আশায় পুলকিত না হোয়ে পারলাম না, কারণ এমন একটা ঘটনা দুর্লভ। গিয়ে কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে একটু হতাশ হোতে হলো, কারণ, যদিও সরকারী চারু ও কারুশিল্প বিদ্যালয়ের মাত্র কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন, খুঁজে পেতে দশ বারোজনের বেশি শিল্পীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য হলো না। এঁরা ছাড়া বাকী সবাই কি এমন একজন চিত্রকরের প্রতি এতই উদাসীন?

যথাসময়ে সিনর সেকেরস্‌ ঢুকলেন। চমৎকার সৌম্য কান্তি চেহারা, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বোল্লেন, "ভারত সরকার আমাকে আমন্ত্রণ কোরেছেন আমার শিল্প সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলার জন্য, কিন্তু আমার শিল্পের কথা

আপনাদের কাছে উপস্থিত করার আগে, যে পটভূমিকায় তার জন্ম, অর্থাৎ তৎকালীন মেক্সিকো, তার কিছু পরিচয় আপনাদের দেওয়া দরকার। তবে ইংরেজীতে বোলতে আমার একটু অসুবিধা হয়, কারণ আমি আমার মাতৃভাষা স্পানিশে ভাবি, তার থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করি, তার থেকে আবার তর্জমা করি ইংরেজীতে; কাজে কাজেই একটু দেরী হয়, এজন্যে ত্রুটি মার্জনা কোরবেন।"

একজন শিল্পী বোল্লেন, "আমরা আবার তাকে বাংলায় অনুবাদ কোরে নিয়ে তবে বুঝি!"

সিনর সেকেরস্ বোল্লেন: ১৯১১ সাল থেকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন কোরছেন। ঐ সময়ে এক ধর্মঘটে তিনি যোগদান করেন। সে ধর্মঘটের দাবী ছিল তিনটে। (১) তখনকার নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে; (২) খোলামাঠে বিদ্যালয় স্থাপন করার পক্ষে; আর (৩) রেলপথ রাষ্ট্রগত করার পক্ষে। এখানে তিনি একটু হেসে বোল্লেন, "এই তৃতীয় সর্তটি যে কি কোরে অন্য দুটির সঙ্গে স্থান পেল, তা অবশ্য কেউই বুঝলো না, তবে একটা কথা বলি, তখন আমার বয়স ছিল পনেরো, এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও তরুণ।"

রাজনীতির সঙ্গে সিনর সেকেরস্ সারা জীবন ধরেই সংশ্লিষ্ট। অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন কোরেছেন, এর কি কারণ? শিল্পীর কি দরকার এমন স্থূল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর? তার উত্তরে তিনি আগেও যা বোলেছেন আজও তাই বোল্লেন: "শিল্পী রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, কূপমণ্ডূক হোয়ে বসে থাকা তাঁর ধাতেও সয় না, সাজেও না। তাঁর দেশের দুঃখ, আনন্দ, হাসি, অশ্রু, সংগ্রাম, স্বপ্নের সাফল্য সম্বন্ধে যদি তিনি উদাসীনই থাকবেন তো ছবি আঁকবেন কি নিয়ে? মধ্যযুগে য়ুরোপের 'রেনেসাঁ'র সময় শিল্পীরা খৃস্টধর্মের জয়গানই গেয়েছিলেন। 'শিল্পে শিল্পেতর কোনো উদ্দেশ্য নেই,' বোলে জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি উদাসীন থাকেননি, তাই তাঁদের কাজ আজও মর্মে এসে স্পর্শ করে। ভারতের গুহার প্রাচীরে যাঁরা ছবি এঁকেছেন তাঁরা দেশের তখনকার অবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাই তাঁদের ছবির মান আকাশচুম্বী। মিশরের মন্দিরের প্রাচীর যাঁরা অলংকৃত কোরেছেন তাঁরা উদাসীন থাকেননি, তাই তাঁদের কাজ দেখে বিস্ময়ে আজও স্তব্ধ হোতে হয়।

"দেশের প্রতি উদাসীন যে নয় তাকেই তখনকার কালে আমাদের দেশে সংগ্রাম কিছু কোরতেই হতো, কারণ তখন মেক্সিকোর যা অবস্থা—এদিকে ইংরেজ ওদিকে স্পেনীয়, একদিকে ফরাসী, অন্যদিকে মার্কিন, সবাই সাম্রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টায় রত—সেখানে হয় সংগ্রাম নয় আত্মবিলোপ। আমরা সংগ্রামই শ্রেয় মনে কোরলাম। সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে বন্ধুভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগও পেলাম, ওতপ্রোতভাবে জড়িত হবার সৌভাগ্যও ঘটল। তখনি উপলব্ধি কোরলাম, যে ঐতিহ্য ছাড়া ছবি আঁকা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে হোল, যে শুধু ঐতিহ্যের রীতি বা ধাঁচ থাকলেই চলবে না, পদ্ধতিও চাই। এবং সেই পদ্ধতির উপর ভিত্তি কোরে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে হবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে শিল্প হবে না, হবে শিল্পের শবদেহ।

"আমাদের দেশের ঐতিহ্য হোচ্ছে প্রাচীরচিত্র অঙ্কন। তাতে আবার আরেক সমস্যা। সে চিত্রের দাম দেবে কে? সরকার ছাড়া তো আর কেউই দেবে না, কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই শিল্পীদের এই একই সমস্যা, ছবি তো আঁকা হলো, কিনবে কে?

"ছবির ক্রেতার অর্থ থাকা প্রয়োজন, অর্থ সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হস্তগত, অতএব আশা করা যায় যে তারাই ছবি কিনবে। কিন্তু একটা কথা বোধহয় সারা বিশ্বে সমানভাবে প্রযোজ্য যে, এঁদের পক্ষপাতিত্ব সাধারণত ছবির চেয়ে বড় বড় গাড়ীর উপরে অনেক বেশি।"

সেকেরস্ বোলতে থাকলেন, "প্রাচীরচিত্র করার জন্য সোৎসাহে লেগে গেলাম। মিকেলাঞ্জেলো ফ্রেস্কো কোরতেন, মায়া ইঙ্কা আজ্‌তেক্ শিল্পীরা ফ্রেস্কো কোরতেন, আমরাও ফ্রেস্কো করবো ভাবতে কেমন যেন মনীতে রক্ত দ্রুততর প্রবাহিত হোতে লাগলো। কিন্তু করার পদ্ধতি কি? কেউ জানে না। আমাদের শিল্পগুরু বলেছিলেন, দেওয়ালে বালি ভিজে থাকতে থাকতে রং দিয়ে যে ছবি হয়, তাকে বলে ফ্রেস্কো। কিন্তু কি বালি? কি রং?—বোলে দেননি, কারণ তিনি নিজেই জানতেন না। দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরাও কেউ বোলতে পারলেন না।

"একদিন, এক রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কথা কোইতে কোইতে

জিজ্ঞেস কোরলাম, 'ফ্রেস্কো কোরতে জানো?' সে বোল্ল, 'ফ্রেস্কো? সে আবার কি জিনিস?' বোল্লাম, 'দেওয়াল ভিজে থাকতে থাকতে তাতে রং লাগিয়ে ছবি আঁকা। দেশী বিদেশী অনেক বই খুঁজেছি, কোথাও কায়দাটা পাচ্ছিনা।' সে বোল্ল 'কি আশ্চর্য, এই ব্যাপার? আমরা তো সবাই এই উপায়েই বাড়ীর দেওয়াল-টেওয়াল রং কোরে থাকি, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

"সাত সমুদ্দুর তের নদী খুঁজে, শেষে ঘরের পাশেই পেলাম!

"পদ্ধতিটি শেখার পর আবার আরেক সমস্যার সম্মুখীন হোতে হলো। ফ্রেমের গণ্ডীর মধ্যে যে ছবি থাকবে তার সঙ্গে প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে যে ছবি থাকবে, তার তারতম্য প্রচুর। একের সঙ্গে আরের কোনো তুলনাই হয় না। না ছন্দের দিক দিয়ে, না রঙের দিক দিয়ে, না সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে। মূল পার্থক্য হোচ্ছে যে ফ্রেমে-আঁটা ছবির দর্শক দেখেন একজায়গায় স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে, তিনিই আবার প্রাচীরচিত্র দেখেন সরে সরে, ঘুরে ঘুরে। অতএব, শিল্পীকেও অঙ্কনের সময় এই মূল কথাটা মনে রাখতে হয়। অর্থাৎ একটা ছোট খসড়া কোরে নিয়ে সেইটা দেওয়ালে বড় কোরে আঁকলে চলবে না।"

তারপর সিনর সেকেরস্ ম্যাজিক লণ্ঠন ও স্লাইড্-এর সাহায্যে পর্দায় নানাভাবে তিনটি প্রাচীরচিত্র

বিরাট পটভূমিকায় প্রাচীরচিত্র অঙ্কনরত শিল্পী সেকেরস্।

দেখালেন। ছবিগুলির নাম 'বুর্জোয়াবাদের প্রতিকৃতি', 'আক্রমণকারী ধ্বংস হোক,' 'আর 'ক্যুবার বর্ণসাম্যের উদ্দেশ্যে রূপক'। কোনটা যে ঠিক কত বড় মনে পড়ে না, তবে একটা সাতশো বর্তা গজ, একটা হাজার, আর একটা বোধহয় বারশো।

প্রথমে সমস্তটা, তারপর টুকরো টুকরো কোরে দেখালেন বটে, কিন্তু মনে হোল যেন চলচ্চিত্র হোলেই সুবিধা হতো। তবু, ছবিগুলির বিরাটত্বের একটা আভাস পাওয়া গেল। বিরাটত্ব মানে শুধু আকারের বিরাটত্ব নয়, মুন্সিয়ানারও। মনে হলো যেন শিল্পী নিজের আবেগকে মূর্ত কোরে দেওয়ালের গায়ে বসিয়ে দিয়েছেন। লাল রংগুলো যেন তাঁরই হৃৎপিণ্ডের রুধির। এক জায়গায় তোতাপাখীর মুণ্ডধারী একটা লোক দেশলাই নিয়ে একটা বাড়ীতে আগুন লাগাচ্ছে। সেটা নাকি ফাশিস্ত্। খুবই উপযুক্ত রূপদান মনে হোল, কারণ ফাশিস্তরা একদিকে ধ্বংসকারী, আরেকদিকে একজন যা বলে তোতাপাখীর মতো সবাই সেই কথার পুনরুক্তি করে। তা ছাড়া, হিটলারের রাইখ্‌ষ্টাগের আগুন লাগানোর কথা কি শিল্পীর মনে হোয়েছিল? হোতে পারে! আর এক জায়গায় একটা অদ্ভুত রকমের পাখী, দেখতে খানিকটা ঈগলের মতো।

সেকেরস্ মশায় বল্লেন, "সাম্রাজ্যবাদীর একটা প্রতীক দরকার, কাকে করি? ভাবলাম, ঈগল পাখী। কাজ কোরতে আরম্ভ কোরছি, এমন সময় মনে হোল, ঈগল অন্য জীবের মাংস খায় বটে, তবু তার রাগ যেমন আছে, ভালবাসাও তো আছে, দরদও আছে, খামখা বেচারাকে অপমান করা কেন? তার চেয়ে বরঞ্চ যন্ত্রচালিত ইস্পাতের ঈগল করা যাক। এই সেই ইস্পাতের ঈগল।"

'আক্রমণকারী ধ্বংস হোক' ছবিটির মাঝখানে দুটি

। মেক্সিকোর একটি বিরাট অট্টালিকার পরিপ্রেক্ষিতে সেকেরসের একটি বৃহৎ প্রাচীরচিত্র।

বিপ্লবী নেতা স্পেনীয় দস্যুদের হাতে পড়ে অত্যাচারিত হোতে দেখা গেল। দস্যুরা তাঁদের পা আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে, কথা বার করার জন্য, কিন্তু কোনোই কাজ হোচ্ছে না। তবে প্রচণ্ড জ্বালা, বিপ্লবীদের শুধু মুখে নয়, সারা শরীরে ফুটে উঠেছে। পাশে বর্মধারী স্পেনীয় সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে। এই কুকুর আর ঘোড়ার সাহায্যেই নাকি মেক্সিকোর অধিবাসী-দের উপর অত্যাচার কোরতে সুবিধা হয়েছিল।

ক্যুবার বর্ণসাম্যের উদ্দেশ্যে রূপক ছবিটি আঁকা একটি ইস্পাতের চাদরের উপর। একটা ডিমের খোলাকে চার ভাগ কোরে তার এক ভাগের ভিতরটা যেমন হয়, এই চাদরটির আকারও সেই রকম। অথচ দেখে সোজা, খাড়া দেওয়াল বোলে ভ্রম হয়। কি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজ কোরে যে এই বিভ্রমটি শিল্পী সৃষ্টি কোরেছেন তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এ ছবির আবহাওয়াটা যেন খোলা মাঠের মতো নির্মল।

এইগুলির পর, তাঁর আঁকা কয়েকটি তৈলচিত্রেরও ছবি দেখানো হলো এবং সর্বশেষে দেখালেন দিয়েগো রিবেরার করা একটি প্রাচীরচিত্র।

রিবেরার সঙ্গে সেকেরসের পার্থক্য যে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর তা নিমেষেই ধরা পড়লো।

সেকেরস্ নিজেই যা বোল্লেন, তার মর্ম এইরূপ—"রিবেরা বলেন, 'শিল্পে মানুষই হোল প্রধান, অতএব মানুষকেই কেন্দ্র কোরে ছবি আঁকা উচিত।' আমি বলি, 'মানুষ তো নিশ্চয়ই প্রধান, কিন্তু মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব প্রধান নয়, প্রধান তার মন, তার আশা, তার সৃষ্টি। ধরুন, মানুষ হাঁটতে হাঁটতে আরো দ্রুত যেতে চায়, তখন সে দৌড়ায়। আরো দ্রুত যেতে চাইলে সে ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে তার উপর চড়ে। আরো দ্রুত যেতে হলে মোটর-গাড়ী চালায়, আরো দ্রুত যেতে চাইলে বিমানে আকাশপথে চলে। কাজেই, বিমানের ছবি আঁকলেও মানুষেরই ছবি আঁকা হলো।

"আমি যখন পারীতে ছিলাম, পিকাসো, ব্রাক্, মাতিস, আঁদ্রে ছ্যর্ঁ্যা প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই আলোচনা হতো। এঁদের মধ্যে কেউ বলেন, শিল্পের মধ্যে প্রধান হোচ্ছে রং, কেউ বলেন গঠনই প্রধান, কেউ বলেন অবচেতন, কেউ আবার বলেন, আবেগ। কিন্তু আমি মনে করি, এই সবের কোনো একটা জিনিষই প্রধান হওয়ার দরকার কি? শিল্পে এই সবগুলির যথাযথ সংমিশ্রণেরই কি প্রয়োজন নয়?

"আমার তাই বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি ছবি আঁকি।"

"বাড়ীর ঘরগুলো জানলাবিহীন হোলে যেমন হয়, বাড়ীর দেওয়ালগুলো চিত্রবিহীন হোলে ঠিক তেমনি হয় নাকি?"

"শাস্ত্রে বলা হয় : সৃষ্টির আদি কথা—মায়া। চিত্রসৃষ্টির আদি কথাও তাই। এমন কি প্রকৃতি-ধর্মী অথবা ন্যাচারালিষ্টিক চিত্রেও আমরা কোন বস্তুর সর্বাংশ আঁকতে সক্ষম নই। কারণ চিত্রপট—সমতল, ইংরেজীতে যাকে ফ্ল্যাট্ বলা হয়। ভাস্কর্যের ন্যায় এই ফ্ল্যাট্ সারফেসে অঙ্কন-বস্তুর সবদিক দেখানো সম্ভব নয়। তাই চিত্রের মাত্র একাংশ এঁকে উহ্য অপরাংশ বোঝাতে মায়াজাল রচনার আবশ্যক, যার দ্বারা সেই অপরাংশের অস্তিত্ব আদপে না থাকলেও, আছে বোলে বিভ্রম রচিত হয়। আর এইখানেই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে চিত্রসৃষ্টির গাঁটছড়া বাঁধা।"

শুভেচ্ছাপত্র

দীনেশ দত্ত

দেশী ও বিদেশী বণিকসম্প্রদায় আধুনিক যুগে দেশীয় চারুকলার মারফৎ কয়েকটি রুচিসম্পন্ন প্রথার প্রবর্তন কোরেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ক্যালেণ্ডার বা দেয়ালপঞ্জী, ডায়েরী বা দিনপঞ্জী, এবং গ্রিটিংস-কার্ড বা শুভেচ্ছাপত্র। বঙ্গানুবাদগুলি কতখানি সার্থক হলো, সে বিচার পাঠকের উপর অর্পণ কোরলাম।

মোগল ও ইংরেজ শাসকবর্গ আমাদের মধ্যে এ সমস্ত প্রথা শুধু প্রবর্তন করেন-ই নি, নানাভাবে দীর্ঘ দিন চালু রাখার ফলে এখন তারা পালনীয় কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হোয়ে গেছে। এদের কালগত পরিবর্তন চরিত্রে নয়, রূপ-সৌষ্ঠবে।

যেমন ধরুন, নববর্ষে হালখাতার নিমন্ত্রণ পাঠানো ব্যবসায়ীমহলের একটি প্রাচীন প্রথা। এ প্রথার অবশেষ বা সারভাইভাল আধুনিক-যুগে গ্রিটিংস-কার্ড বা শুভেচ্ছাপত্র পাঠানোর মধ্যে স্পষ্টীকৃত। বিজয়া দশমীতেও শুভেচ্ছা প্রীতি-সম্ভাষণ পাঠানো আর একটি পুরোনো প্রথা। আধুনিক যুগে শুভেচ্ছা-পত্র বা গ্রিটিংস-কার্ডের চলন এ-ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

এই গ্রিটিংস-কার্ড ইত্যাদি জিনিষের ব্যবহারের জন্য দেশীয় বণিকসম্প্রদায় তাঁদের বিদেশী বন্ধুদের কাছে ঋণী। তবে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁরা এ-সব জিনিষে দেশীয় ভাবধারা পরিস্ফুট করার কোন চেষ্টা করেননি। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একমাত্র 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'ই এ-সমস্ত জিনিষে ভারতীয় চারুশিল্পের প্রয়োগের প্রচেষ্টা কোরেছিলেন। সাধারণভাবে বোলতে গেলে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গ্রিটিংস-কার্ড ইত্যাদি চেহারাতেও ছিল পুরোপুরি বিদেশী, অভারতীয়।

শিল্পী—দীপেন বসু।

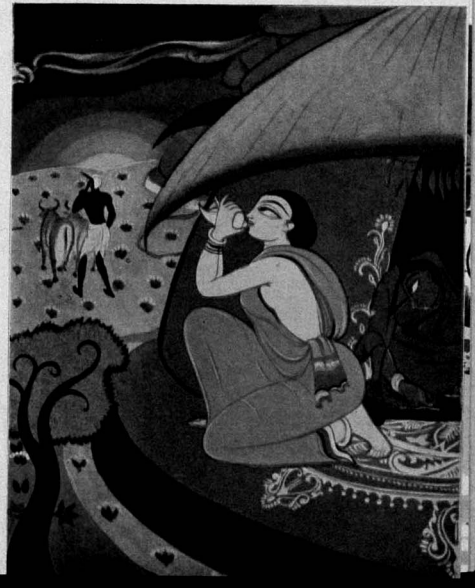

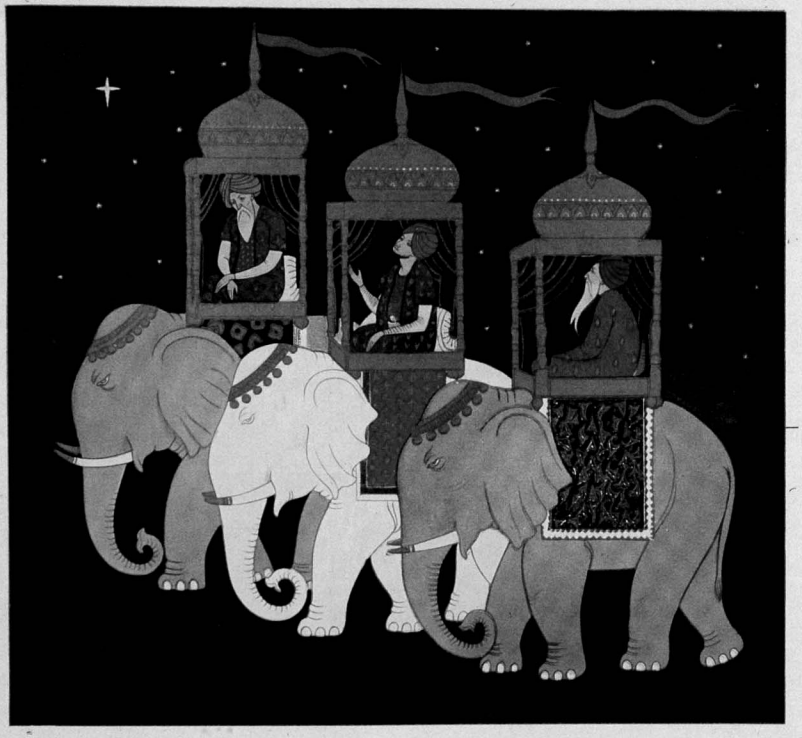

শিল্পী—ও, সি।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৪০ সালে 'আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি মুভমেণ্ট' সুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বার্মাশেল। অন্যান্য আর পাঁচটি দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই আন্দোলনের সূচনা।

ইতিপূর্বে দেয়ালপঞ্জীতে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, উইণ্ডসর

প্রাসাদ ইত্যাদি দেখিয়ে আমাদের দেশের লোকদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করা হতো। এলিজাবেথ আর্ডেন, ম্যাক্সফ্যাক্টর ইত্যাদি প্রসাধনদ্রব্যের বিজ্ঞাপনে এক অদ্ভুত ভারতীয় নারীচিত্রের অবতারণা করা হতো। শাড়ী-পরা ইউরোপীয় মহিলার মতোই এ নারী বিসদৃশ, স্বাভাবিক শ্রীহীন। রুক্ষ-রুঢ়, কর্কশ, কোমলিমা-বর্জিত। এবং স্বভাবতই এ-জাতীয় নারী ভারতীয়ের পক্ষে অচিন্তনীয়।

আর্ট-ইন্-ইণ্ডাস্ট্রির আন্দোলন এরকম ধরনের বিজ্ঞাপনশিল্পে কুঠারাঘাত করলো। বিজ্ঞাপনশিল্পে এলো এক আমূল পরিবর্তন। নানান ধরনের উন্নতির লক্ষণ পরিস্ফুট হলো এই শিল্পে। যে কোনও একটি সংবাদপত্র খুললে এই উন্নতি চোখে পড়ে। ক্যালেণ্ডার বা গ্রিটিংস-কার্ড এখন আর বেশিরভাগক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা হয় না। বিদেশী এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় চারুশিল্পের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে কোরে চলেছেন। তার সার্থক প্রয়োগ কোরছেন বিজ্ঞাপনশিল্পের নানাক্ষেত্রে। বিজ্ঞাপনশিল্পে ভারতীয় চারু-কলার প্রসার কিভাবে করা যায় সঙ্গের গ্রীটিংস-কার্ডগুলি থেকে তা প্রমাণিত হবে।

প্রথম ছবিটি বার্মাশেলের বাংলা নববর্ষের (১৩৬৩, ইংরাজী ১৯৫৫) শুভেচ্ছাপত্র।

শিল্পী—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শিল্পী—উষারঞ্জন দত্তগুপ্ত।

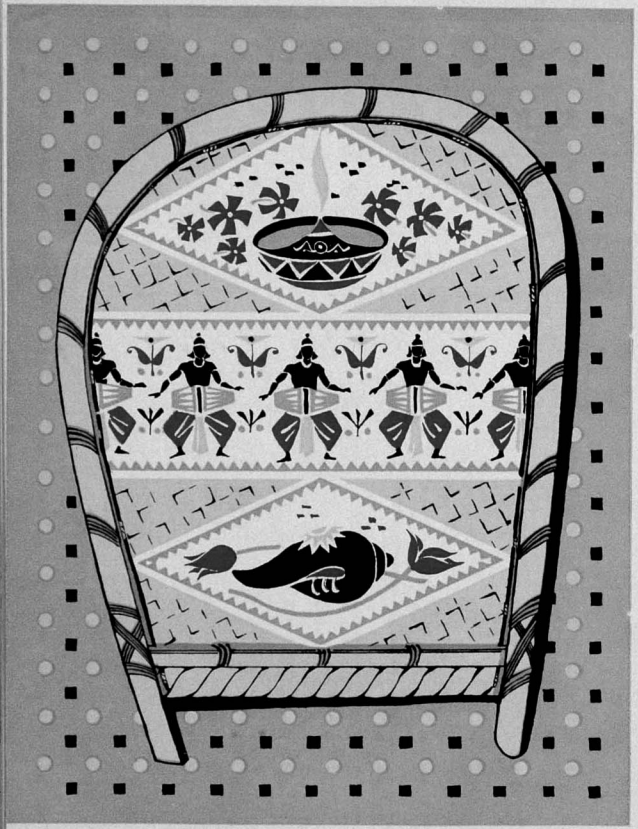

এতে একটি কুঁড়েঘরের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। কুঁড়েঘরের দাওয়ায় ও দেয়ালে আলপনা আঁকা। দরজার উপরে মঙ্গল-পত্র। সর্বত্রই শুভলক্ষ্মীর পদচিহ্ন। ঘরণী এক-পা মুড়ে শাঁখ বাজিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন নতুন দিনকে। তাঁর পশ্চাতে আর একজন মহিলা। অদূরের ধানক্ষেতে চাষা চাষ করছে। পারস্পেক্টিভ রচনা ও নানা রঙের

বিচিত্র ব্যবহারে ছবিটি সত্যই সুন্দর। এবং ছবিটির সর্বত্রই ভারতীয় ভাবালোক পরিকীর্ণ!

দ্বিতীয় ছবিটি ডান্‌লপ কোম্পানীর শুভেচ্ছাপত্র। তিনটি হাতিতে চড়ে চলেছেন তিন জ্ঞানী। আকাশে অনেক তারা। এই আকাশের পটভূমিতে আঁকা তিনটি হাতি ও তিন জ্ঞানী। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল নয়। কারণ এ আকাশ রাত্রির আকাশ। মাটির রং অন্ধকারের কালো। হাতি তিনটির দুটি ধূসর। মাঝেরটি সাদা। এই সাদা হাতি, আর দুটি হাতির মধ্যে সুন্দর একটি ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

তৃতীয় ছবিটি ডান্‌লপ কোম্পানীর ১৯৫৫ সালের 'পোঙ্গল'-এর শুভেচ্ছাপত্র। এটি দক্ষিণ ভারতের 'পোঙ্গল' উৎসবের ছবি। এই উৎসব আমাদের নবান্ন উৎসবের মতো।

শিল্পী—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শিল্পী—শংকর নন্দী।

একটি নির্মেঘ উজ্জ্বল দিন রূপায়িত হোয়েছে এতে। নববর্ষের নবীন আনন্দ অজস্র ফুলের লাল উচ্ছ্বাসে এবং মেলার মধ্যে পরিস্ফুট।

চতুর্থ ছবিটি ফি লি প্ স কোম্পানীর। ১৯৫৭ সালের ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছাপত্র। ভারতীয়দের মঙ্গলপ্রতীক একটি কুলো এই ছবির বিষয়বস্তু। কুলোতে আঁকা ছবি। উপরে মঙ্গলদীপ ও ফুল নীচে মঙ্গল শঙ্খ ও পদ্ম। মাঝে মাদল বাজিয়ে কয়েকটি পুরুষমূর্তি। মঙ্গলের সঙ্গে আনন্দের যোগ,—দীপ-শঙ্খের সঙ্গে বাদ্যরত পুরুষ-মূর্তি। বিষয় কল্পনা বা অঙ্কনরীতি উভয় দিক থেকে ছবিটি পুরোপুরি ভারতীয় বা বাঙালী।

মাত্র দু' রঙের ছবিও কত সুন্দর হোতে পারে তার প্রমাণ

পঞ্চম ছবিটি। মণিপুরী নৃত্যরত একটি পুরুষ ও নারী। পুরুষ মাদল বাজিয়ে তাল দিচ্ছে তার সঙ্গিনীর নাচের সঙ্গে। রঙের সুষ্ঠু ব্যবহার ও মিতব্যয়িতা এবং আঁকার দিক থেকে ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি অ্যাট্‌লান্টিস

শিল্পী—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

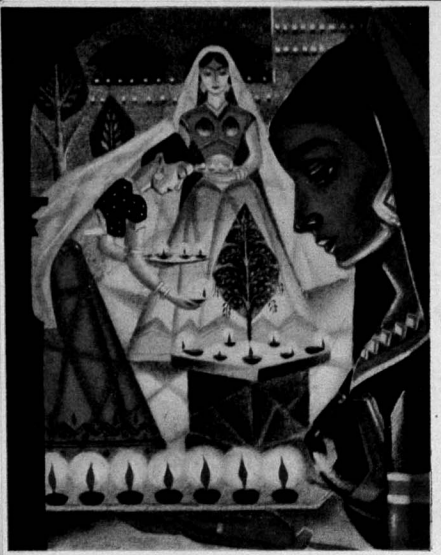

শিল্পী—কল্যাণ সেন।

ইস্ট-এর ১৯৫৭ সালের ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছাপত্র।

ষষ্ঠ ছবিটি টাটা কোম্পানীর ১৯৫৬ সালের দেয়ালীর শুভেচ্ছাপত্র। দেয়ালীর রাত্রে জনৈকা পুরনারী প্রদীপ নিয়ে চলেছে দীপান্বিতায় সাজিয়ে দেবার জন্য। তিনদিকে তার উঁচু উঁচু বাড়ি। এর মাঝখানে একা সে চলেছে। দূরে আরো কয়েকজন পুরনারীকে দেখা যাচ্ছে। স্পেস, কম্পোজিশন এবং রঙের যথাযথ ব্যবহারে ছবিটি বিশিষ্ট।

সপ্তম ছবিটি ডানলপ কোম্পানীর ১৯৫৪ সালের ঈদের শুভেচ্ছাপত্র। পারসিক চিত্ররীতিতে আঁকা ঈদের প্রীতি-আলিঙ্গনের দৃশ্য। পটভূমি, কম্পোজিশন, প্রান্তিক অলংকরণ ও রঙের ব্যবহারে ছবিটি সত্যই প্রশংসনীয়।

সর্বশেষ ছবিটি দেয়ালী উৎসবের। ১৯৪৮ সালের বার্মাশেলের শুভেচ্ছাপত্র। তিনটি নারীর ছবি। দুটির পূর্ণচিত্র, একটির আবক্ষচিত্র ও কিয়দংশ দৃশ্যমান। পশ্চাতের দুজন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে ব্যস্ত। এদের পশ্চাতে আরো কয়েকটি সারি সারি প্রদীপ এঁকে সমস্ত ছবিটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হোয়েছে। সামনের মেয়েটির ছবির গড়ন অনেকটা ত্রিকোণাত্মক। রং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিশ্র। ছবিটির গতিশীলতা ও সর্বাত্মক সুষমা-সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

এই ছবিগুলি ভালো কোরে দেখলে, ভালো কোরে বিচার কোরলেই বোঝা যাবে ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্প আজ কতখানি উন্নত, কতখানি শিল্প-সুন্দর।

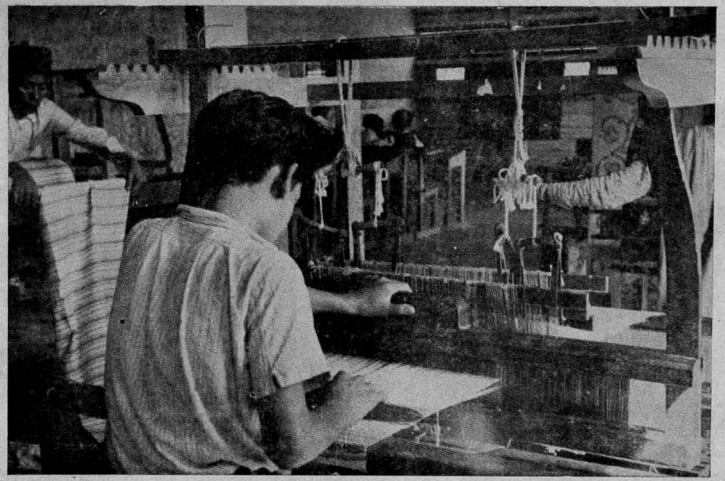

তাঁত ও বয়নশিল্প

বিশ্বনাথ চৌধুরী

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাঁত ও বয়নশিল্পের আবির্ভাবের ক্ষণটি হয়তো সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তবে একথা সত্য, যান্ত্রিক বয়নশিল্পের আবিষ্কার ও প্রভাব বিস্তারের বহু শতাব্দী পূর্বে তাঁত ও বয়নশিল্প, সৌন্দর্যে ও উৎকর্ষে পাশ্চাত্য জগতের সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছিল, শুধু তাই নয় বাংলার মসলিনের সমাদর তখন ইউরোপের অভিজাত শ্রেণীর সৌখিন রুচিবোধের পরিচয় হিসাবে গণ্য হতো। ইতিহাস অনুশীলনে জানা যায় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময়ে বিদেশে ব্যাবসার বেশ প্রসার ছিল।

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঢাকার মসলিনের প্রচার ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোনারগাঁ পরগণার অনতিদূরে অবস্থিত সেরিপুর সহর নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়। এই সেরিপুর সহর তখনকার দিনে বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

১৬০৮ খৃস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হবার পর ব্যাবসা-বাণিজ্য ঢাকা সহরকে কেন্দ্র কোরে গড়ে ওঠে।

১৬৬৬ খৃস্টাব্দে টাভার্নিয়ারের বিবৃতিতে, বাণিজ্য-প্রধান সহর হিসাবে ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের তখন ঢাকায় বস্ত্রশিল্পের কারখানা ছিল। নবাবের রোষদৃষ্টির ফলে ইংরাজের কারখানা অবশেষে বন্ধ হোয়ে যায়।

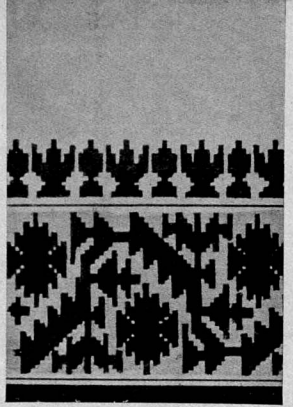

জাম্‌দানি শাড়ীর একটি নক্‌শা।

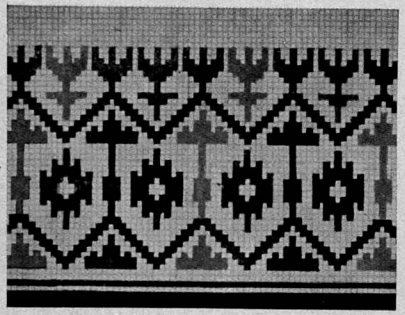

জাম্‌দানি শাড়ীর আর একটি নক্‌শা।

১৭২৪ খৃস্টাব্দে মিঃ স্টার্ক আবার নতুনভাবে বস্ত্রশিল্পের কারখানা চালু করেন এবং ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত কারবার ভালোভাবেই চলতে থাকে। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কোলকাতা অধিকার করেন, তখন এই কারখানার মালিকানাও নবাবের দখলে আসে। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় কারখানা দখল করেন।

মোগল রাজত্বের সময় নবাব পরিবার ও দরবারের পদস্থ কর্মচারীর ব্যবহারের জন্য সূক্ষ্ম মসলিন ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চলে প্রস্তুত হতো। স্থানীয় অভিজ্ঞ এবং হুদক্ষ তাঁতীদের সেখানে কাজে ভর্তি করা হতো, তাদের নাম রেজিস্টা করা থাকতো, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাদের হাজিরা দিতে হতো। যতক্ষণ না হাতের কাজ শেষ হতো ততক্ষণ তারা ছাড়া পেত না। তাদের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্যে কর্মচারীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকতো।

কড়া শাসনের ভয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়া, কিংবা কোন কিছু দুরভিসন্ধির বুদ্ধি তাদের মাথায় আসতো না।

অনিচ্ছুক তাঁতীদের সায়েস্তা করার জন্যে একজন সতর্ক প্রহরী সর্বদা নিযুক্ত থাকতো। পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরলে, অমানুষিক প্রহার চলতো, তাছাড়া তাদের মজুরীও কাটা যেত।

সরকারের কড়া পাহারায় বন্দী থেকে খুব অল্প মজুরীতে তাঁতীরা সরকারের জন্যে কাজ কোরতে বাধ্য হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার কারখানায় জন দুই ইংরাজ কর্মচারী ও বাকী সব দেশীয় কুলি মজুর থাকতো। তারা কাপড় বাছাই করা, চালান দেওয়া

। ফুলিয়া শিল্প-কেন্দ্রে নির্মিত একটি জাম্‌দানি শাড়ীর প্রতিলিপি।

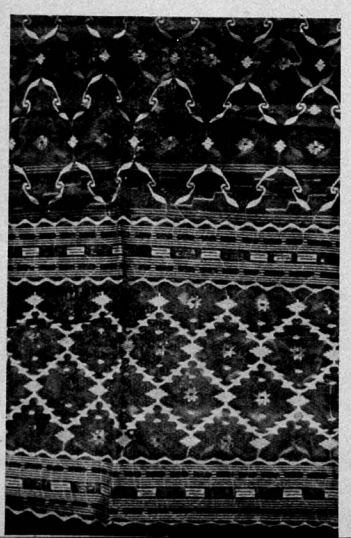

এই সব কাজ করতো। দালালদের সাহায্যে তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় সংগ্রহ করা হতো।

১৭৪৭ খৃস্টাব্দে ২৮৫০০০০ টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দশ বৎসর পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ গড়পড়তা বার্ষিক সতের লক্ষ টাকার কম নয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ কাপড়ই সংগ্রহ করা হতো গ্রামের তাঁতীদের কাছ থেকে।

১৮১৩ খৃস্টাব্দে রপ্তানির পরিমাণ একবারেই কমে যায়—১৮১৭ খৃস্টাব্দে কোম্পানির কারখানা বন্ধ হোয়ে যায়।

মোগলদের সময়ে তাঁতীদের শোচনীয় দুরবস্থার কথা উল্লেগ কোরতে গিয়ে মিঃ হিণ্ডম্যান বলেছেন :

They were deeply indebted to Dalals and Paikars, many had left their homes, those who remained had little desire to work seeing that the fruit of their labours passed into the hands of others and they alleged that at the ruling prices weaving did not afford them a living wage.

১৮২১ খৃস্টাব্দে প্রথম বিলাতি সুতোর আমদানির সঙ্গে সঙ্গে দেশী সুতোর মূল্য কমে যায়। বিলাতি সুতোর দাম কম, সংগ্রহ করতে সময় লাগে না—দু-শো, তিন-শো নম্বরের সুতো যত খুশি পাওয়া যায়।

একসময় কশিদা (বিভিন্ন নক্‌শা-তোলা তাঁতের) তুর্কী সেনাদের পাগড়ীর কাপড় হিসাবে ব্যবহার হতো—বছরে চার লক্ষ টাকার কশিদা এই ব্যাপারে বিক্রী হতো। কিন্তু পাগড়ীর ব্যবহার উঠে যেতে বলা বাহুল্য, কশিদার চালানও বন্ধ হলো।

মসলিন কথাটা মৌসুল শব্দ থেকে এসেছে। তুর্কী এশিয়ায় মৌসুল নামে একটি সহর আছে, মনে হয় মসলিন কাপড় প্রথম সেখানেই তৈরী হয়।

বয়ন-শিল্পের নকশায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য।

ঢাকার মসলিনের জন্মকাল প্রায় একই সময়ে বলা যেতে পারে।

ঢাকার তাঁতীদের বয়ননৈপুণ্য ও কলাকৌশলের মাধুর্য সকলকে বিস্মিত করতো। একগজ চওড়া বিশ গজের মসলিন থান ভাঁজ কোরে একটি আংটির মধ্যে

। সুতো ঠাকুর কর্তৃক বাংলার আল্পনা পুতুলের ঢঙে একটি পর্দার নক্‌শা।

অনায়াসে প্রবেশ করানো যেত। এবং তার ওজন ন-শো রতির বেশি হতো না। জলের স্রোতে ফেললে মসলিনের কাপড় মিশে যেত, চোখে দেখা যেত না, শিশিরে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিলে, তাও ক্রমশ অদৃশ্য হতো, এত সূক্ষ্ম সে কাজ হাতে তৈরী কোন জিনিষ বোলে মনেই হতো না।

মসলিনের ওপর নানারকমের নক্‌শা তোলা শাড়ী জামদানি শাড়ী নামে পরিচিত। তাঁতে বোনার কাজ চলতে থাকে, কাগজে আঁকা নক্‌শা শাড়ীর নীচে পিন দিয়ে আটকে দেওয়া হয়,—বোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতী কাগজের দিকে লক্ষ্য রাখে কখন নক্‌শা তোলার কাজ আরম্ভ করতে হবে—ঠিক জায়গায় এসে সে সুঁচের (বাঁশের সরু চেলা) সাহায্যে নক্‌শা তোলে। দু-জন একসঙ্গে জামদানি শাড়ীর কাজ করলে নক্‌শা তোলা এবং বোনার সুবিধা হয়। একটি জামদানি শাড়ীর দাম ২০ টাকা থেকে ৪০০।৫০০ টাকা পর্যন্ত হোতে পারে।

কশিদার কথা আগেই বলেছি। মুসলমান মেয়েরা এই সব নক্‌শা তোলার কাজ কোরত। কশিদার চাহিদা অনুসারে এডেন, বসোরা, কন্‌স্টান্‌টিনোপল প্রভৃতি স্থানে চালান যেত।

ঢাকা সহরে নবাবপুর, তাঁতিবাজার, ফল্‌তাবাজার প্রভৃতি স্থান জামদানি শাড়ী তৈরীর কেন্দ্র বলা যেতে পারে। মফঃস্বলের কেন্দ্র—সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, বালিয়াটি, আবদুল্লাপুর, মুরিস্বরী, মাতাইল।

সূক্ষ্ম মলমলের থান এক সময় ঢাকায় তৈরী হতো, মসলিনের ওপর চিকন কাজের জন্যে ঢাকার প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত।

ঢাকার মসলিনের মতো মুর্শিদাবাদের বালুচর বুটিদার শাড়ী একদা বয়নশিল্পে সৌন্দর্যের প্রকৃষ্ট নমুনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ কোরেছিল। শাড়ীর সুন্দর জমির ওপর বিচিত্র নক্‌শা, কোণে ও আঁচলায় নক্‌শার কাজ; অলংকারের অভিনবত্বে, বয়ননৈপুণ্যের উজ্জ্বলতায় সহজেই কলারসিক-দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর কাছে এর মূল্যও যথেষ্ট ছিল। একটি ১০ হাত ৪৫ ইঞ্চি শাড়ীর দাম ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা।

টেবিল রুথ ও রুমাল কাশ্মিরী শালের অনুকরণে নক্‌শা

তুলে তৈরী করা হয়। ভাল বুটিদার শাড়ী তিন চার মাসের আগে বোনা শেষ হয় না। এই সব বুটিদার শাড়ী, রুমাল প্রভৃতির বয়ননৈপুণ্যের উৎকর্ষ শুধু দুবরাজ তাঁতীর ভালোভাবে জানা ছিল, দুবরাজই এই তাঁত ঠিকভাবে চালু কোরতে পারত। দুবরাজের পরিচালনায় অন্য সব তাঁতীরা কাজ কোরত।

দুবরাজের মৃত্যুর পর এই সব সূক্ষ্ম বুটিদার শাড়ীর বয়ন-কার্যের অনুশীলন লোপ পেতে বসেছে।

বর্তমানে দুবরাজের শিষ্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বুটিদার

শাড়ীর জন্য শিল্পী শ্যামাদাস সেনের একটি মৌলিক লহরী নক্‌শা।

শাড়ীর বয়ননৈপুণ্য জানেন। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, দু-একজন শিক্ষানবীশকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের চেষ্টায় বালুচর বুটিদারের খ্যাতি একবারে লোপ পাবে না। এটুকু ভরসা করা যায়।

দুঃখদুর্দশাক্লিষ্ট তাঁতীদের জীবন, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় মোগল আমল থেকে সর্বদাই বিপন্ন হোয়েছে, দেখতে পাই। মুনাফাখোর মহাজনদের স্ফীতকায় লোভ তাদের গ্রাস করেছে, মেহনতির উপযুক্ত মূল্য তারা কোনদিনই পায়নি।

দেনার দায়ে সর্বস্ব বিকিয়ে তারা ফকির হোয়েছে, শিল্পীর একাগ্রতা নিয়ে তারা সাধনা করেছে, সূক্ষ্ম সুনিপুণ কাজের জন্যে তাদের প্রতিষ্ঠা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিনিময়ে অভাবমোচনের জন্যে উপযুক্ত অর্থ সম্পদ তাদের হাতে আসেনি।

ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে এত দুঃখ সয়েও যে তাঁতীরা আজও বেঁচে আছে, তা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয় দেয়।

একথা সকলেই জানেন তাঁতশিল্প কুটিরশিল্পের মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প হিসাবে একটি প্রধান স্থান অধিকার কোরেছে।

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাঁতশিল্প থেকে প্রস্তুত হয়।

১৯৩৪ সালে ভারত সরকার প্রথম সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁতশিল্পকে সাহায্য কোরতে অগ্রসর হলেন। প্রাদেশিক সরকারের হাতে পাঁচ বৎসরের জন্যে তাঁতশিল্পের উন্নয়নকল্পে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলো। প্রাদেশিক সরকারও তাদের রাজকোষ থেকে কিছু টাকা যোগ কোরলেন। মাদ্রাজে তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হলো, অন্য প্রদেশে সে-সময়ে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

এই সমবায় সমিতি থেকে সুবিধা দরে তাঁতীদের সুতো সরবরাহ করা হতো। উন্নত ধরনের তাঁতের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন নক্‌শা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা হতো।

১৯৩৯ সালে ভারতে উৎপন্ন মোট বস্ত্রের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি উৎপন্ন হয়েছিল তাঁতশিল্প থেকে।

কিন্তু এত অধিক উৎপাদনেও তাঁতীদের আর্থিক অবস্থার তেমন কিছুই উন্নতি হয়নি, বেশি উৎপাদনের জন্যে বাজারে কাপড়ের দাম কমে যাওয়ায় তাঁতীর আয়ও সেই অনুসারে কমে গিয়েছিল।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার তাঁতশিল্পের উন্নতি বিধান-কল্পে তাঁত ও তাঁতীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি কমিটির নিযুক্ত করেন। এই সব তথ্য বিবেচনা কোরে কমিটির উপদেশক্রমে ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত তাঁতশিল্প সংস্থা (অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার কাজ হলো তাঁতীদের কাঁচামাল সরবরাহ, তাঁতজাত জিনিষ বিক্রয়-ব্যবস্থা এবং আবশ্যকমতো অর্থসাহায্য দেওয়া। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা সক্রিয় ছিল তারপরে বন্ধ হোয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার কুটিরশিল্প সংস্থার অধীনে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন এবং ১৯৫০ সালে ভারত সরকার দশ লক্ষ টাকার একটি তহবিল বিভিন্ন প্রদেশসমূহে তাঁতশিল্পের উন্নতি-কল্পে বণ্টনের জন্যে কমিটিকে নির্দেশ দান করেন।

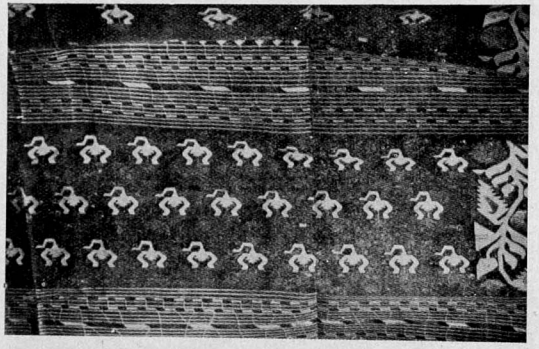

ফুলিয়া শিল্পকেন্দ্রে তৈরী একটি জামদানি শাড়ী।

প্রাদেশিক সরকারের ২৭টি পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁতশিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ নানাকারণে আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে বাইরে থেকে আমদানী কমে যায়। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা প্রধানত ভারত থেকেই করা হয়। বিভিন্নক্ষেত্রে সুতো বণ্টনের ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। এর ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্প উপযুক্ত পরিমাণ সুতোর অভাবে সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ফলে তুলার চাষের জমি কমে যাওয়াতে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অবস্থা ক্রমশ অবনতির ধাপে ধাপে শোচনীয় পর্যায়ে এসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারত সরকার এই সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে সব দিক বিবেচনা কোরে, তাঁতশিল্পের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে নিখিল ভারত তাঁতশিল্প (পর্ষৎ) সংস্থা নতুন-ভাবে গঠন করেন।

আমাদের দেশে তাঁতীর মূল সমস্যা অর্থনৈতিক। দরিদ্রের নিষ্পেষণে তারা সর্বদাই সংকুচিত। নতুন কোন কিছু গ্রহণ করবার আগ্রহ বা উৎসাহ তাদের কম।

এদেশে সর্বার তাঁতীদের (মাস্টার উইভার) প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁতীদের অল্প মজুরীতে নিযুক্ত করে। অনেক সময় টাকা বা সুতো দাদন দেয়, বিনিময়ে শুধু মজুরী দিয়ে উৎপন্ন বস্ত্র কিনে নেয়। লাভের অংশ তাঁতীর ভাগে পড়ে না। বাংলা-দেশে অনেক তাঁতী বৎসরে কয়েকমাস তাঁতের কাজ করে। বাকী সময়ে কৃষিকর্মাদি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

তাঁতশিল্পের সামগ্রিক উন্নতি কোরতে হোলে তাঁতীদের অভাব, অভিযোগ, দোষ, ত্রুটি, অশিক্ষা কুসংস্কার সব দিক বিচার কোরে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে সংগঠনের কাজে

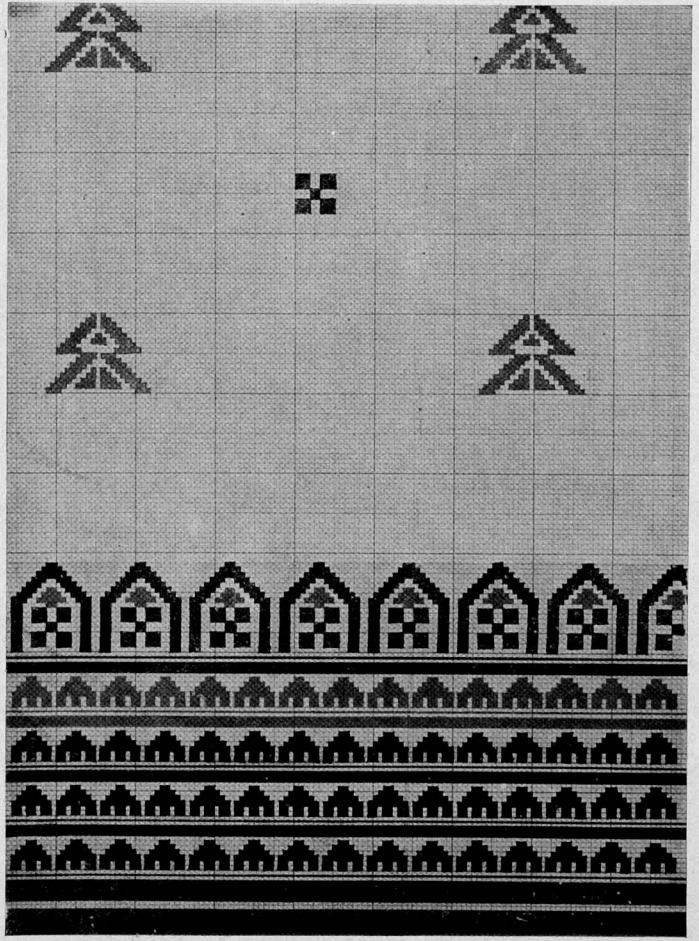

'গ্রাফ্'-এ করা শাড়ীর একটি নক্‌শা

মনোনিবেশ কোরতে হবে। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে ব্রতী হোয়েছেন।

তাঁতীদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করার জন্যে এবং তাঁতশিল্পকে কুটিরশিল্পের মধ্যে সর্বপ্রধান শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব থেকে পাওয়া যায়, ভারতে উনত্রিশ লক্ষ তাঁতে প্রায় সাতাশি লক্ষ কারিগর কাজ করে।

পশ্চিমবাংলায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাঁত চালু আছে এবং প্রায় তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কারিগর এই কাজে নিযুক্ত।

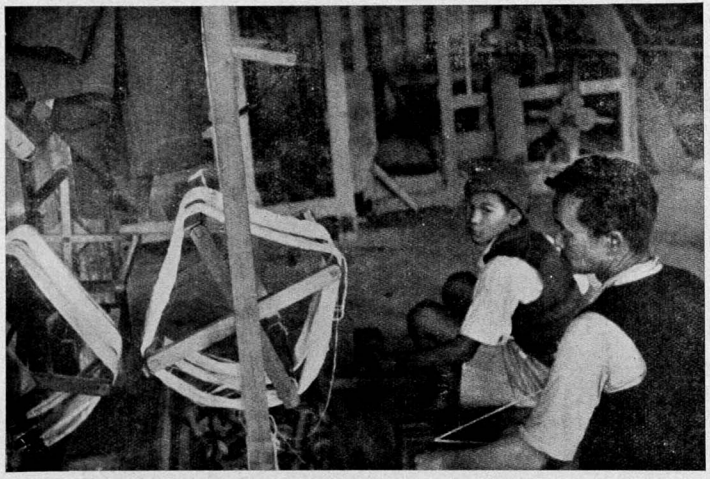

। কর্মব্যস্ত তাঁতশালার একটি দৃশ্য।

বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের এক-চতুর্থাংশ তাঁতশিল্প থেকে তৈরী এবং আনুমানিক একশো কোটি টাকার তাঁতবস্ত্র বাজারে বিক্রী হয়।

পশ্চিমবাংলায় বিক্রী হয় আট কোটি টাকার ওপর।

পশ্চিমবাংলায় সুতোর প্রয়োজন দুই কোটি পাউণ্ড, এর বেশির ভাগই দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানী করা হয়।

পশ্চিমবাংলার তাঁতীর আয় মাসে ৬০ থেকে ৮০ টাকা। তাঁতের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, এর মধ্যে ঠক্‌ঠকি তাঁত এক লক্ষ সাড়ে চৌদ্দ হাজার। হাত-তাঁত সাড়ে সাত হাজার, আর অর্ধস্বয়ংক্রিয় চিত্তরঞ্জন তাঁত হলো তিন হাজারের কিছু বেশি।

ডবি আর জ্যাকার্ডের সংখ্যা—ডবি পাঁচ হাজার, জ্যাকার্ড সাড়ে চার হাজার।

পাড়ে নক্‌শা তোলার জন্যে ডবি এবং জ্যাকার্ড ব্যবহার করা হয়।

তাঁতশিল্প যে সব দোষত্রুটির জন্যে এখনও পিছিয়ে আছে তার মধ্যে প্রধান হলো :

(১) দারিদ্র্য। তাঁতীকে এ দুরবস্থার অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার কোরতে হবে। মহাজনের ঋণের অক্টোপাশ থেকে দায়মুক্ত না হোলে তার বাঁচার উপায় নেই।

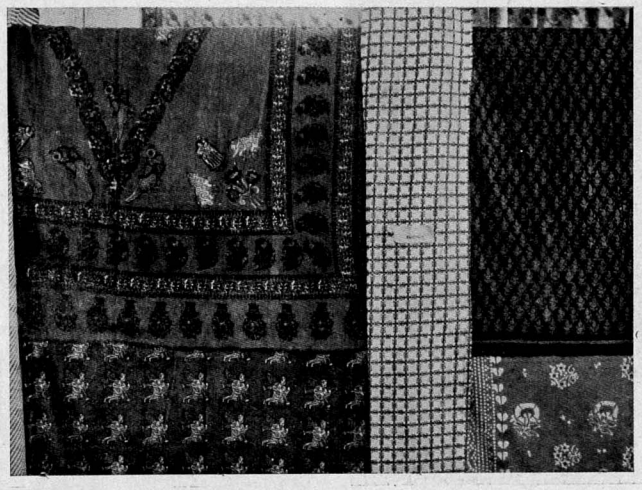

। প্রদর্শিত বয়নশিল্পের নানারূপ নমুনা।

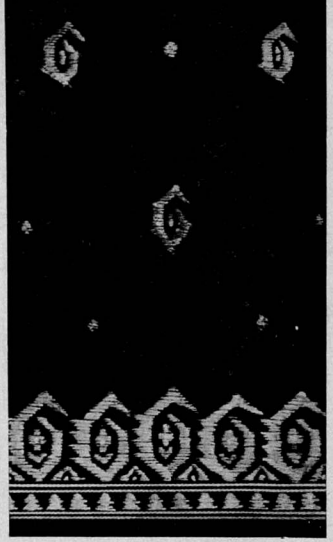

হাতে বোনা ঢাকাই শাড়ীর নমুনা।

প্রদর্শিত বয়নশিল্পের কয়েকটি নমুনা।

(২) উন্নত ধরনের শিক্ষার অভাব। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি আয়ত্তে আনতে হবে। সংরক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ কোরে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ধরনের রঞ্জন-প্রণালীর প্রবর্তন, আধুনিক রুচি অনুযায়ী নক্‌শা ও পাড়ের ডিজাইন প্রচলন একান্ত আবশ্যক। তাঁতশিল্পের প্রতি সাধারণের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যে আধুনিক রুচিসম্পন্ন নানারকমের শিল্পসম্ভার প্রস্তুত কোরতে হবে।

(৩) অল্প মূল্যে সুতো ও কাঁচামাল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা কোরতে হবে।

(৪) চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন কোরে উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা কোরতে হবে।

(৫) সমবায়ের ভিত্তিতে তাঁতশিল্পকে সংগঠন কোরতে হবে।

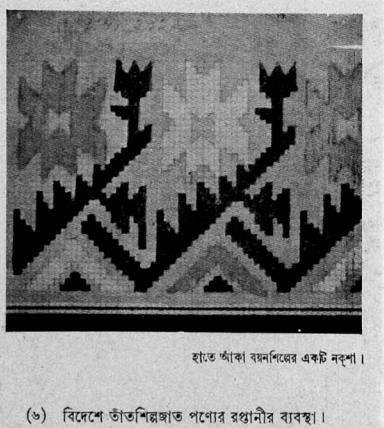

হাতে আঁকা বয়নশিল্পের একটি নক্‌শা।

(৬) বিদেশে তাঁতশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানীর ব্যবস্থা।

সুমাত্রা, জাভা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে ভারতের তাঁতজাত বস্ত্র—যথা সারোঙ, লুঙি, মাদ্রাজী ছিট (মাদ্রাজ হ্যাণ্ডকারচিফ) চালান যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতে প্রস্তুত সারোঙের পাকা রঙ ও সুন্দর নক্‌শার জন্যে চাহিদা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

বোর্ণিও, জাভা ও ইন্দোনেশিয়ার পুরুষেরা পরিধেয় বস্ত্র হিসাবে সারোঙ লুঙ্গির মতো ব্যবহার করে। মেয়েদের জন্যে হাতে ছাপা সারোঙ বিক্রী হয়।

মাদ্রাজী ছিট প্রচুর পরিমাণে গাউনের কাপড় হিসাবে আফ্রিকা ও বর্তমানে আমেরিকায় চালান যায়।

বিছানার চাদর, জানালার পরদা, টেবিল ক্লথের কাপড়ও বিদেশে রপ্তানী হয়। নিউজিল্যাণ্ডে বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক বৎসর প্রায় হাজার হাজার টাকার চাদর ও পর্দার কাপড় রপ্তানী করা হোয়েছে।

বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে।

পশ্চিমবাংলায় তাঁতশিল্প কুটিরশিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কোরে আছে। বাংলার তাঁতীদের গৌরবময় দিনগুলি এখনও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হোয়ে আছে।

বাংলার তাঁতীদের সেই ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্যের পরিচয় এখনও নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া যায় :

শান্তিপুর, মেহেরপুর—শান্তিপুর সূক্ষ্ম বয়নকাজের জন্যে চিরদিন সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। নক্‌শাপাড় শাড়ীর জন্য শান্তিপুর চিরদিন বিখ্যাত হোয়ে থাকবে।

বীরভূম—বীরভূম জেলায় রায়পুর, তাঁতিপাড়া, বোলপুর, কালিপুর, তাঁতশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তাঁতিপাড়ায় তসরের শাড়ী ও কেটের কাপড় তৈরী হয়।

বাঁকুড়া—গোপীনাথপুর, রাজাগ্রাম, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে নানারকমের ধুতি শাড়ী প্রস্তুত হয়। বিষ্ণুপুরের রেশম শাড়ীর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত।

বর্ধমান—দেবীপুর, কালনা, নিরোল, মীরতলা, বৈকুণ্ঠপুর, সমুদ্রগড়।

মালদহ—ভবানীপুর, দরিয়াপুর।

হাওড়া হুগলী—শ্রীরামপুর, ধনেখালি, চন্দননগর, গোবিন্দপুর, জয়নগর, ফুলিয়া।

মেদিনীপুর—হরিদাসপুর, রামজীবনপুর, অমর্ষি, চর-শিমুলিয়া, ময়না, প্রতাপদীঘি, মুগবাড়িয়া, কাঁথি।

মুর্শিদাবাদ—মীর্জাপুর, চক ইসলামপুর।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ একথা সকলেই জানেন শতকরা ৭০ জন লোক এখানে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু বৎসরে বারোমাস কৃষির কাজ থাকে না—প্রায় ৬।৭ মাস বেকার থাকতে হয়। পরিবারে সমস্ত খরচ কৃষির আয় থেকে নির্বাহ করা যায় না, সুতরাং অন্য কিছু কোরতে হয়।

পশ্চিমবাংলায় লোকসংখ্যার চেয়ে চাষের জমির পরিমাণ কম। মাথাপিছু যা জমি মেলে তা চাষ কোরে বৎসরের খোরাক হয় না, সুতরাং আয়ের অন্যপথ অবলম্বন না কোরলে বাঁচবার উপায় নেই।

এক্ষেত্রে কুটিরশিল্পের অনুশীলনই একমাত্র পথ, আর কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্পই দেশের সম্পদ ও জাতীয় জীবনের মানবৃদ্ধির সন্ধান দিতে পারে।

গ্রামকে কেন্দ্র কোরে আমরা অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা কোরছি। গ্রামের তাঁতী সেই অর্থ নৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষা কোরবে এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

দেশের সামগ্রিক উন্নতি, সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পের ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভরসার কথা, জাতীয় সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা তাঁতশিল্পের গৌরবময় সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হোতে চলেছি। তাঁতশিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমরা অর্থ নৈতিক বৈষম্য উচ্ছেদ করার পথ-নির্দেশ পাব, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

এই সঙ্গে বয়নশিল্পের কয়েকটি পরম্পরাগত ও আধুনিক নক্‌শা, আমরা যা সংকলিত কোরেছি তা তাঁতশিল্পের বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজে লাগতে পারে ভেবে ছাপানো হলো।

"আবহমান কাল থেকে কি চারুশিল্পে কি হস্তশিল্পে উপকরণের উপর শিল্পকরণের উপযুক্ত এবং বৈধ মিলনের মাধ্যমেই পূর্ণ পরিস্ফুটন যে সবিশেষ নির্ভরশীল—তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

"ধরা যাক্ পাথর। এই পাথর খোদাইয়ের কাজকে পাথরের স্বধর্ম বজায় রেখে শিল্পকরণ করণীয়। অর্থাৎ স্কাল্‌প্‌চার হোলে সেটা কেষ্টনগরের কাদায় গড়া পুতুল কোরলে চলবে না—স্কাল্‌প্‌চারাস্‌ক্ হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। তেমনি আবার কেষ্টনগরের পুতুল কাদার স্বধর্ম বজায় রেখে যখন নিটোল এবং মোলায়েম হোয়ে গড়ে ওঠে, তখন তারা ঠিক সেই একই কারণে শিল্পকার্য হিসেবে কৃতকার্যের সমাদর লাভ কোরে থাকে।

"আজকাল বিশেষ কোরে বাংলাদেশে, বিবাহ জন্মদিন ব্যতীতও ভি আই পি তথা মন্ত্রী উপমন্ত্রী অথবা ঐরূপ কোন বিশিষ্ট লোকের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে মার্বেল মোজেক এবং সিমেন্টের মেঝের উপর আলপনা দেওয়া একটা ঢং অথবা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উপকরণের সঙ্গে শিল্পকরণের সেতুবন্ধ বাঁধার দিক দিয়ে বিচার কোরলে নজরে পড়ে যে তারা সুনিশ্চিত স্বধর্ম হোতে ভ্রষ্ট।

"মার্বেল মোজেক এবং সিমেন্টের মেঝের পক্ষে কার্পেট সতরঞ্চি অথবা কারুকার্য সম্বলিত শালু-ই স্বাভাবিক—আলপনা নয়। গ্রামাঞ্চলে মাটির ঘরে গোবর-ন্যাপা আঙিনায় এর আত্মিক স্ফুরণ। প্রাসাদ অথবা হর্ম্যের মর্মরের মেঝেতে আলপনার শোভা বিচিত্র হোতে পারে, সৌখিন হোতে পারে, কিন্তু কখনই তা স্বাভাবিক এবং সচল হবে বোলে আস্থা স্থাপন সম্ভব নয়।

"একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে,—যে-বস্তুর উপর, যে-শিল্পকাজ করা হবে—সেই বস্তুর স্বাভাবিক রূপ ও গঠন সম্পর্কে সচেতনতা সহ উপকরণের সঙ্গে শিল্পকরণের ছন্দোবদ্ধ যোগরক্ষা অবশ্য পালনীয়।"

ডুভিন

আশু চট্টোপাধ্যায়

ডুভিনের বাবার ছিল পর্দার কারবার। বেশ ভালোই চলছিল। ছবি কেনার বাতিক যখন ডুভিনের মাথায় ভর করল, তখন তিনি, অর্থাৎ ১৯০১ খৃস্টাব্দে ভান হুনারের আঁকা 'লেডি লুইসা ম্যানারস্' ছবিটি চোদ্দ হাজার পাউণ্ড দিয়ে এক নিলামে কিনে ফেললেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইতিপূর্বে একটি ছবি এত দামে কখনো বিক্রী হয়নি। কিন্তু এই হলো ডুভিনের ইতিহাস সুরু। তিনি তাঁর অসন্তুষ্ট বাবাকে বোঝালেন যে আর্ট-সংগ্রহ কেনা বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে অনেক রকম জিনিষ একসঙ্গে পাওয়া যায়। বাবাকে খুশি করবার জন্য এরপর অর্থাৎ ১৯০৬ খৃস্টাব্দে, ডুভিন বার্লিনে অস্‌কার হায়নোয়ারের আর্ট-সংগ্রহ কিনলেন পঁচিশ লাখ ডলার দিয়ে। এতে বিচিত্র-ধরনের অসংখ্য পর্দা ছিল। বাবার মুখ প্রসন্ন হলো কিন্তু এই গগনচুম্বী দাম দেখে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। তারপরই ডুভিন পারীতে কিনলেন রুডল্‌ফ্ কান-এর সংগ্রহ তিরিশ লাখ ডলার দিয়ে। ব্যাঙ্কের কাছে কারবারের ধার হলো পঞ্চাশ লাখ ডলার। বেচারী বাবার ব্লাড্‌প্রেসার সাংঘাতিক মাত্রায় বেড়ে গেল। তারপর একদিন হঠাৎ তাঁর মাথার শিরা ছিড়ে যাওয়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মরে বাঁচলেন। এবং ঠিক তার পরেই ডুভিন পারী শহরে আর একটি সংগ্রহ কিনলেন তিরিশ লাখ ডলার দিয়ে। সর্বসমেত আর্টের জিনিষ কেনা হলো এককোটি ডলারের। শিরা না ছিঁড়লেও, বাবা বেঁচে থাকলে এতদিনে তাঁর হার্টফেল হতো নিশ্চয়ই। এইসব ছবি ডুভিন একটি দুটি কোরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রী কোরেছিলেন। এতটাকার জিনিষ একসঙ্গে কিনে চল্লিশ বছর ধোরে তা বিক্রী করবার দৃষ্টান্ত আর্ট-ব্যাবসার ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিরল। বাজারে প্রথম পদক্ষেপ করেই এতটা সাহসই বা আর কে দেখাতে পেরেছেন! অথচ মৃত্যুর সময় ডুভিন তাঁর মেয়ের জন্য রেখে গেছেন সত্তর লাখ ডলার দামের সম্পত্তি। এই অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে তিনি জীবনের যে দিকে যেতেন সেদিকেই যে অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে যেতে পারতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জীবনের সুরুতে যে খেয়ালী লোকটি আর্টের বাজারে তাণ্ডব সৃষ্টি কোরেছিলেন, হৃদয়ের কারবারেও যে তাঁর সব সময় নাগাল পাওয়া যাবে তা নিশ্চয়ই ছিল দুরাশা। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিয়ে স্থির হলো দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ-ব্যবসায়ী আইজ্যাক লুইসের মেয়ের সঙ্গে। ডুভিনের কাকীমার নিমন্ত্রণে বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে এল নিউইয়র্কের এক মধ্যবিত্ত তামাক-ব্যবসায়ীর মেয়ে এল্‌সি সালামন। বিয়ের আগে একটি ছোটখাট পার্টিতে এল্‌সির সঙ্গে ডুভিনের

হলো প্রথম পরিচয়, মীনকেতনের নৃত্যও সুরু হলো তাঁর রক্ত-কণিকায়। আগের বিয়ের প্রস্তাব বাতিল কোরে ডুভিন বিয়ে কোরলেন এল্‌সিকে। তাঁদের হলো একটি মাত্র মেয়ে, কিন্তু ডুভিনের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এল্‌সিই তাঁর গৃহ আর মনকে আলোকিত কোরে রেখেছিল।

পড়াশুনা ডুভিন মোটেই পছন্দ কোরতেন না। তবে তাঁর নিজের সংগ্রহ-করা কোনো ছবির সম্বন্ধে যদি কোথাও আলোচনা থাকত তাহলে সেটি তিনি সংগ্রহ কোরে পড়তেনই, কিন্তু তাঁর পড়বার প্রণালীটি ছিল অভিনব। বইটির অনাবশ্যক একগাদা লেখা পড়বার মতো তাঁর সময় কোথায়! তিনি তাই নির্বিবাদে তাঁর প্রয়োজনীয় পাতাগুলি বই থেকে ছিঁড়ে পকেটে পুরতেন। এমনকি ব্রিটিশ মিউজিয়মের বই হোলেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না। তাঁর এই কৌতুকপ্রদ দুষ্কর্মটি এমনি প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে কোনো পাঠক যদি কোনো পাঠাগারের অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করত, "দেখুন, এই বইটির মধ্যে কতকগুলি পাতা নেই," অধ্যক্ষ একটু হেসে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন, "এ তাহলে ডুভিনের কাজ।" তাঁর পড়াশুনার বহর সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা আছে। একবার কোনো আদালতে বিপক্ষের উকিল তাঁকে প্রশ্ন কোরেছিলেন, "রাস্‌কিনের 'ষ্টোন্‌স্ অব ভিনিস' আপনি দেখেছেন কি?" ডুভিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "ছবিটির নাম অবশ্য আমি এর আগেই শুনেছি, কিন্তু সেটি দেখবার সৌভাগ্য আমার এ-পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।" যখন তাঁকে বলা হলো যে ওটি একটি বই-এর নাম, ছবির নয়, তিনি একটুও অপ্রস্তুত না হোয়ে উত্তর দিলেন, "আমার বরাবর ধারণা ছিল যে রাস্‌কিন ছবি আঁকতেন, আর খুব বাজে ছবি আঁকতেন।"

বই-এর চেয়ে থিয়েটারের উপর ডুভিনের টান ছিল বেশি। বিশেষ করে 'একজোড়া চশমা' নাটকটির অভিনয় হোলে তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা যেত না। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এক ভদ্রলোক সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ব্যস্ততার জন্য আর একজনের চশমা ভুল কোরে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তারই ফলে সারাদিন তাঁর ভাগ্যে যত বিড়ম্বনা ঘটেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রহসনটি। এই নাটকের উল্লেখ কোরে ডুভিন প্রায়ই বোলতেন যে কি ছবির ক্ষেত্রে, কি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভুল চশমার ভিতর দিয়ে দেখাতেই যা-কিছু হাঙ্গামা। ছবির ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর মক্কেলদের এই নির্ভুল দৃষ্টিক্ষেপের ব্যবস্থা ডুভিনই কোরে দিতেন।

তবে ডুভিন মক্কেল নিতেন অনেক পরীক্ষা কোরে, অনেক বেছে। নতুন কেউ এলে বোলতেন, "সস্তা জিনিষ কিনে প্রথমে হাত পাকাক না, তারপর দেখা যাবে।" সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর সার জন লেভারির স্ত্রী তাঁর কাছে একবার কালিফর্নিয়ার এক ব্যবসায়ীকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছবি কিনতে চান। ডুভিন ইচ্ছা কোরে ভদ্রলোককে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে দিলেন। তারপর তাঁকে তাঁর সংগ্রহশালায় নিয়ে রেমব্রাণ্টের একটি ছবি দেখালেন এবং দাম চাইলেন একলক্ষ ডলার। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে ভদ্রলোক ওই দাম দিতে রাজী হোয়ে গেলেন। তবু না দমে ডুভিন প্রশ্ন করলেন, "আপনার আর কতগুলি রেমব্রাণ্ট আছে?" "কোথায় আর! এই ত সবে আমি ছবি কেনা সুরু করেছি।" "তাহলে আমি এটি আপনাকে বিক্রী করতে পারি না। আমার রেমব্রাণ্ট আপনার বাড়িতে একা-একা বোধ কোরবে। অমনি ছবি, অর্থাৎ ওই ধরনের ছবি আগে আরো কিছু কিনে পাকা খরিদ্দার তৈরী হন, তবে ত।" ডুভিন উপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক এর পর ডুভিনের কাছ থেকেই অনেকগুলি কম দামী ছবি কিনলেন। তারপর একদিন অ্যাটল্যাণ্টিক সমুদ্র পার হোয়ে জাহাজে কোরে তাঁর নির্বাচিত রেমব্রাণ্টের ছবিটি তাঁর হাতে শেষ পর্যন্ত পৌছাল।

শিকাগো সহরে অনেকগুলি রেস্তরাঁর মালিক জন টম্‌সন স্থানীয় এক দালালের মারফত কিছু-কিছু ছবি কিনতেন। যত তাঁর রেস্তরাঁর সংখ্যা বাড়তে লাগল, তাঁর ছবির ক্ষুধাও সেই পরিমাণে বেড়ে চলল। যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেও শেষে দালালটি বুঝতে পারল যে এ-মক্কেলকে সামলানো তার কর্ম নয়, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হোয়ে তিনি দড়ি ছিঁড়ে অন্য লোকের কাছে যাবেনই। তাই সে একদিন ডুভিনকে গিয়ে জানাল যে একটি শাঁসালো মক্কেলকে হাজির করতে পারে যদি ডুভিন অনুগ্রহ কোরে তাকে মুনাফার একটা ক্ষুদ্র অংশও দেন। ডুভিন রাজি হোয়ে হেসে বোললেন, "কিন্তু আমার কাজের ধরন দেখে যেন ভড়কে যেও না।"

যথাসময়ে লোকটি টমসনকে নিয়ে হাজির হলো। ডুভিন তাঁদের একঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁদের ডুভিনের সমীপে হাজির করা হলো।

ডুভিন সদয় কণ্ঠে প্রশ্ন কোরলেন, "আপনার রেস্তরাঁর ব্যাবসা আছে নাকি। লিয়ন্‌সের রেস্তরাঁগুলির মতো হবে?"

উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই তিনি লিয়ন্‌সের রেস্তরাঁগুলি কেমন, সেগুলি কেন তাঁর পছন্দ হয়, রেস্তরাঁ কিভাবে করলে ভালো চলে, ভাল খাবার কম দামে পরিবেশন করতে পারলে যে সমাজসেবাও হয় ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তারপর প্রশ্ন করতে লাগলেন টমসনের ভাল রেফ্রিজারেটার কতগুলি আছে, কত মাল রোজ বিক্রী হয় ইত্যাদি।

সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় টম্‌সন মরিয়া হোয়ে বলে উঠলেন, "দেখুন, রেস্তরাঁ-ব্যাবসার বিষয় আলোচনা করবার জন্য আমি ট্রেণের ধকল সহ্য কোরে নিউইয়র্কে আসিনি। আমি ছবি কিনতে চাই।"

"ওঃ ছবি!" এতক্ষণে ডুভিনের যেন হুঁশ হলো। "তা বেশ ত, আমার সঙ্গে ওপরে চলুন, কিছু কিছু ছবি আপনাকে দেখাচ্ছি।"

উপরে একটা স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে দিয়ে ডুভিন দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পিছনে তাঁরা দুজন। সেই ঘরে ছ-জন বিখ্যাত চিত্রকরের ছ-টি নাম-করা ছবি ইজেলে সার সার বসানো ছিল। ডুভিন সে ঘরে থামবার একটুও লক্ষণ দেখালেন না, যেন তিনি অন্য ঘরে গিয়ে অন্য ছবি এঁদের দেখাতে চান। ঘর থেকে বেরুবার দরজার কাছে গিয়ে টমসন একবার ফিরে তাকালেন, অমনি ছবিগুলির উপর নজর পড়ায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল।

তিনি ডুভিনকে ডেকে ফেরালেন, বললেন, "এই ত এখানে কতগুলি ভালো ভালো ছবি রয়েছে।"

তাঁর হাত ধোরে ডুভিন খুব মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "মিষ্টার টমসন, এ-ঘরে আপনার কেনবার মতো কিছু নেই।"

"কেন নেই!" টম্‌সন নাছোড়বান্দা, "এগুলি আমার ভালো লেগেছে।"

"এগুলি আমার এক প্রিয় মক্কেলের জন্যে রিজার্ভ কোরে রাখা আছে, তাঁর এগুলি আপনার চেয়ে বেশি পছন্দ।"

পছন্দের প্রতিযোগিতায় টম্‌সন কারুর কাছে হারতে রাজি নন। তিনি বললেন, "জানেন, সার জোসেফ্, আমার বাড়িতেও ভালো ভালো ছবি আছে। এগুলি আমার চাই।"

"থাক না এগুলো," ডুভিন বললেন, "আমার কাছে আরো অনেক ছবি আছে, যা আপনার ভালো লাগবে। এগুলো নাইবা নিলেন।"

"কারণটা কি খুলে বলুন না। আসল কারণ।"

এইবার উপায়ান্তর না দেখে ডুভিন স্পষ্ট কথা বলতে বাধ্য হলেন।

তিনি জানালেন যে ছবিগুলির যা দাম তা হয়তো মিষ্টার টম্‌সন দিতে পারবেন না।

"ওই ছ-খানার দাম কত?"—টম্‌সন জানতে চাইলেন।

"এই দশ লাখ ডলার আর কি!" ডুভিন যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন।

"ওই দামই আমি দেব।"—দাঁতে দাঁত চেপে টম্‌সন বললেন।

এই সব ছবি ডুভিনকেও সংগ্রহ করতে হত অনেক দাম দিয়ে। তাঁকে বলা হয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেনদার। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তাঁর সবশুদ্ধ ধার ছিল এক কোটি সত্তর লক্ষ ডলার। তাঁর পিতৃবন্ধু লর্ড ফার্কুহার পারস্ ব্যাঙ্কের কর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন আবার রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডেরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি ডুভিনকে ধার দিয়েছিলেন বারো লক্ষ পাউণ্ড। এ-টাকা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আর ফিরে পাননি। তাছাড়া মর্গান, ওয়াইডেনার, হাণ্টিংডন প্রমুখ প্রধান মক্কেলরা ছিলেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মালিক। তাঁদের ব্যাঙ্কে মোটা মোটা অঙ্কের ওভারড্রাফ্‌ট ডুভিনের জন্য সব সময় ব্যবস্থা করা থাকত। কারণ তাঁরা সবাই জানতেন যে তাঁর চিত্র সংগ্রহের দাম তাঁর ধারের চেয়ে অনেক বেশি। তাই মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি একবার তাঁর অনেকগুলি ছবি বেচে দিলেন। তারপর দেখা গেল সব দেনা শোধ কোরে হাতে তিরিশ লাখ পাউণ্ড জমেছে। তাছাড়া তখনো ছবি আছে প্রায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের!

লাখ লাখ টাকার লেন-দেন তাঁর কাছে ছিল একটা সিগারেট ধরানোর সামিল। নিজের পুঁজি কত এবং

সেইমত কতটা খরচ করা চলে এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত তাঁর ছিল না। দানেও তাঁর হাত দরাজ ছিল। ব্রিটিশ রেড-ক্রস্‌কে তিনি দু-লক্ষ পাউণ্ড দান করেছিলেন। যে-সব ছবি তিনি কিনতেন তার দাম নিতে এলে তিনি একবারও ভেবে দেখতেন না টাকা তৎক্ষণাৎ দেওয়া যায় কিনা। সেক্রেটারী ব্রয়েলের উপর ঢালা অর্ডার দিয়ে দিলেন, "এঁকে দশলাখ পাউণ্ডের একটা চেক্ দিয়ে দিন ত।" ব্রয়েলকে আদেশ পালন করতেই হতো, কিন্তু তারপর তিনি হিমসিম খেতেন খেয়ালী প্রভুর সেই হুকুম তামিল করতে গিয়ে।

আমেরিকার লক্ষপতিরা যখন কোটিপতিতে পরিণত হচ্ছিলেন, বিশিষ্ট ছবি এবং আর্ট-বস্তুর মালিকানা নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও সেই অনুপাতে বাড়ছিল। এই সব ঘোড়েল ব্যাবসাদার টাকার কুমিরদের ডুভিন বোঝাতেন, "ভেবে দেখুন একবার ছবি-ই একমাত্র জিনিষ যা কেনবার সময়েই খরচ, কিন্তু যা রক্ষা করবার জন্য বছর বছর খরচ নেই। পনেরো বছর পরে কয়েকশ ডলার মাত্র খরচ কোরে একবার, পরিষ্কার করালেই যথেষ্ট।" এই যুক্তির ফল হতো প্রায় সবক্ষেত্রেই মোক্ষম। তাঁর তূণে আর একটি অস্ত্রও ছিল, "ভেবে দেখুন, এই ছবিটার যা দাম সেই টাকাটা আপনি দু'দিনেই রোজগার কোরে ফেলবেন, কিন্তু একবার হাতছাড়া হোলে আর কখনো এটি পাবেন না।"

অথচ সব চেয়ে মজার কথা এই যে তাঁর চিত্রশালা থেকে ছবি বা আর্টের কোনো জিনিষ কিনতে গিয়ে সফল হওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ছবি-আঁকা টালি কিনতে গিয়ে স্বয়ং রকফেলার বিফল-মনোরথ হোয়ে ফিরে এসেছেন। একবার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কোরে ডুভিনের পুরনো মক্কেল মিষ্টার হার্স্ট ভারী মন নিয়ে ডুভিনের চিত্রশালায় হাজির হোলেন। ডুভিন সেই সময় বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হোচ্ছিলেন, সঙ্গে নিচ্ছিলেন ভ্যান্‌ডাইকের 'রানী হেনরিয়েটা মারিয়া।' ছবিটি দেখেই হার্স্টের মনে হলো এটি যদি তিনি বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন তাহলে তাঁর মেজাজটা ভালো হয়। কিন্তু ডুভিন তাঁকে জানালেন যে ছবিটি তিনি লেডি ডুভিনকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই সেটি তিনি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যাপারটা ফ্যাসাদের হোয়ে দাঁড়াল। সুরু হলো একটা রীতিমত টাগ-অব-ওয়ার। দুজনই দুজনকে অনুনয় কোরে বোঝাতে চাইছেন, অথচ কেউ কারুর কথা শুনবেন না। শেষে ডুভিন বললেন, ও ছবি যদি তাঁকে ছাড়তে হয় তাহলে রীতিমত ভাল দাম না হোলে ছাড়বেন না। মোটা অঙ্কের লাভ থাকলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলতে পারেন। হার্স্ট দাম জানতে চাইলেন, ডুভিন জানালেন পৌনে চার লক্ষ ডলার।

ছবিটি নিয়ে বাড়ি পৌছাবার আগেই হার্স্টের মনে হলো, দামটা সত্যই খুব বেশি হোয়ে গেছে, রোকের মাথায় এতটা গোঁয়ার্তুমি করা ঠিক হয়নি। তাঁর স্ত্রী সব কথা শুনে হেসে ফেলে বললেন, "মেজাজ ঠাণ্ডা করতে আমিও বেরিয়েছিলাম, কিন্তু একটা নতুন টুপি কিনেই খুশী হোয়ে বাড়ি ফিরেছি।"

মিসেস হার্স্টের ডুভিনের উপর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তিনিও ডুভিনের জীবন সম্বন্ধে অনেক জায়গায় বলেছেন ও লিখেছেন। তাঁর মতে ডুভিনের কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতে গেলেই তিনি বলতেন হয় সেটি কারুর জন্য রিজার্ভ করা আছে, নয়ত সেটি তাঁর স্ত্রীকে দেবেন বোলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিংবা কোনো কারণে সেটি তখন তিনি বিক্রী করতে চান না। অনেক ধস্তাধস্তির পর তবে তিনি সেটি ছাড়তে রাজি হতেন। ডুভিনের কাছ থেকে যদি কেউ ছবি বা অন্য কোনো জিনিষ কিনতে পারতেন, তিনি ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জিতেছেন এই ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, কিন্তু দাম যে তাঁকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ দিতে হয়েছে, একথা প্রায়ই তাঁদের মনে হতো না।

কোটিপতিদের ঘাড় ভাঙবার আর একটি প্যাঁচ ডুভিনের ছিল এবং সেটিও মনস্তাত্ত্বিক। এই সব আমেরিকানরা টাকার কুমির হলেও, অভিজাত রক্ত সাধারণত তাঁদের শিরায় বইত না। তাই যে-সব ছবি আগে কোনো লর্ড বা রাজবংশের কারুর ঘরে টাঙানো থাকত সেগুলি কিনে তাঁরা যেন সেই আভিজাত্যের অংশীদার হয়েছেন মনে করতেন। ডুভিনের মতে এই সব আভিজাত্যের ছাপ দেওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি প্রথম শ্রেণীর ছবির চেয়ে বেশি দামে বিক্রী করা সহজ ছিল। তিনি অবশ্য তাঁর মক্কেলদের ঠকাতেন না। খুঁজে খুঁজে

এই পেডিগ্রি-ধারী ছবিই সংগ্রহ কোরতেন আর তাদের হাত বদলের ফিরিস্তি দিয়ে ক্যাটালগ ছাপিয়ে রাখতেন। মিসেস্ হার্স্টের মতে ছবির সঙ্গে এই সব ক্যাটালগের জন্য আমেরিকার কোটিপতিরা পাগল ছিল।

নিজের সংগৃহীত ছবি ও শিল্প-বস্তুগুলির উপর মাঝে মাঝে ডুভিন বইও ছাপাতেন। তাক থাকত সব সময় কোনো-না-কোনো কোটিপতির উপর। অনেক অর্থ ব্যয় কোরে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে সব চেয়ে দামী কাগজে ছাপিয়ে অপূর্ব মলাট দিয়ে এইসব বইগুলি তিনি বের করতেন। এক একটি সংগ্রহের সব ছবি বা আর্টের জিনিষের পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস তাতে দেওয়া থাকত। এক একটি বই এত ভারী হতো যে তোলা যেত না। বিখ্যাত ড্রেকাস-সংগ্রহের উপর লেখা এই রকম তিন খণ্ড বই দেখে ক্রেস ওই সংগ্রহের সব জিনিষগুলিই কিনে নিলেন। তিনি সকলকে বোললেন, যে-সংগ্রহের উপর এমন তিনখানা বই, তার জিনিষগুলি যে খুবই মূল্যবান সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। বেশিরভাগই ব্রোঞ্জের মূর্তি ছিল। কেনার পরও সেগুলি বহু বৎসর ডুভিনের কাছেই পড়ে রইল। কেবল বই তিনটির নাম বদলে নতুন নাম হল—ক্রেস্-সংগ্রহ। কিন্তু জিনিষগুলি ডুভিনের কাছ থেকে কেন আনা হচ্ছে না এক বন্ধু এই প্রশ্ন করলে ক্রেস্ উত্তর দিয়েছিলেন, "সেগুলো ওজনে অত্যন্ত ভারী, যেখানে আছে থাক না। বইগুলো পড়ে ত লোকে বুঝবে ওগুলো আমারই জিনিষ।"

এই আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে ডুভিন ক্রেতাদের অমর হোয়ে থাকবার সম্ভাবনাও বিক্রী কোরতেন। বেশিরভাগ কোটিপতিরা ছিলেন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, তাই অমৃতের পুত্র হবার অভিলাষ তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল। আভিজাত্যের ছাপ মারা ছবিগুলি ডুভিন তাঁর মক্কেলদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন, যেন কেউ বঞ্চিত না হন। তাঁরাও সেই সুযোগের জন্য তীর্থের কাকের মত তাঁর মুখাপেক্ষী হোয়ে বসে থাকতেন। কবে ডুভিনের অনুগ্রহ লাভ করা যাবে তার প্রতীক্ষা কোরতেন। রাজা চতুর্দশ লুই, মারী আঁতিওনেৎ বা সম্রাট সার্লেমানের ব্যবহার করা জিনিষ ঘরে তোলা মানে ত আর্টের জগতে বা সামাজিক জীবনে অমর হওয়া, তার কাছে ডলার আর সেণ্টের প্রশ্ন ত অতি তুচ্ছ। ডুভিনকেও ত অনেক অর্থ ব্যয় কোরে সেগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাই ডুভিন-যুগে তাঁর আশেপাশে মক্কেলরা ডলারের বস্তা ঘাড়ে কোরে অনুগ্রহভিখারী হোয়ে পোষা কুকুরের মতো ঘুরঘুর কোরতেন আর সম্রাটের মহিমা নিয়ে ডুভিন প্রসাদ বিতরণ করতেন। তাঁর সমকক্ষ আর্ট-ডিলার জগতে আর জন্মাননি।

ছবি বা অন্য আর্ট-বস্তু বিক্রী করতে ডুভিনের নারাজ হবার প্রধান কারণ এই যে তিনি বাজারে বেশি ছবি ছাড়তে চাইতেন না। কারণ তাতে সেগুলির বাজার দর পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া তিনি চাইতেন না যে বাজারে নতুন আঁকা ছবি চলুক। নতুন আঁকা ছবি যেখানেই দেখতেন তিনি কিনে নিচের তলার একটি গুদাম ঘরে জমা কোরে রাখতেন। কারুর সামনে বের করতেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাজারে শুধু দুষ্প্রাপ্য পুরনো ছবিই চলুক। তাতে দামটা ঠিক থাকবে। তাছাড়া নতুন আঁকা ছবিগুলো প্রায়ই কম দামের এবং কম দামের ছবির লেন-দেন করা ডুভিন মোটেই পছন্দ করতেন না, তাহলে তাঁর মর্যাদার হানি হতো। তাছাড়া তাঁর মক্কেলরা ছবিতে শারীরিক সৌন্দর্য চাইত, এবং তা কেবলমাত্র পুরনো ছবিতেই পাওয়া যেত, বিশেষ কোরে হল্‌স্ আর রেম্‌ব্রাণ্টের ছবিতে।

একদিন ডুভিন ফিফ্‌থ্ এ্যাভিনুয়ে তাঁর আর্টিস্ট বন্ধু মরিস স্টার্ণের কাছে গিয়ে বোললেন, "দুটো ভাল ছবি কিনেছি। তবে নিচের গুদোম-ঘরে পাঠাবার পূর্বে আমার ইচ্ছা তুমি সে দুটি একবার দেখ।" ছবি দেখে আর্টিস্টের মাথা ঘুরে গেল। চক্ষু বিস্ফারিত করে তিনি বললেন, "এত ভাল ছবি দুখানা নিচে বাজে মালের গুদোম ঘরে পাঠাচ্ছ! তুমি চেষ্টা করলেই বেশি দামে এ দুটো বিক্রী করতে পারবে। ডুভিন হেসে উত্তর দিলেন, দুটিই যে পুরুষের মূর্তি। মেয়েদের চেহারা হোলে তিন গুণ দামে ও-দুটো আমি বিক্রী করতে পারতাম। আমার মক্কেলরা ছবিতে সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায়।"

তবে এইসব হাল-আমলের তৃতীয় শ্রেণীর আর্ট-বস্তু কেনায় সব সময় ডুভিনের ক্ষতি হতো না, তবে লাভ হতো অন্যভাবে। কোথাও এই ধরনের ছবি দেখলে (বিশেষ কোরে

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের) ডুভিন শুধু একবার প্রশ্ন কোরতেন, "কি, ছবিখানা বেচবেন নাকি? তাহলে দাম বলুন।" তারপর মত বা দামের জন্য অপেক্ষা না কোরে একেবারে দশহাজার পাউণ্ডের চেক দিয়ে দিতেন। তারপর অবশ্য যথারীতি সেটি নিচের গুদাম-ঘরে পাঠানো হতো। কিন্তু তারপর থেকে শক্তিশালী লোকটি বিনা বেতনে ডুভিনের প্রচারকের কাজ কোরতেন। তারই ফলে ডুভিনের জীবনে খ্যাতি এবং ব্যাবসা আরও সহজসাধ্য হোয়ে উঠত। (চল্‌বে)

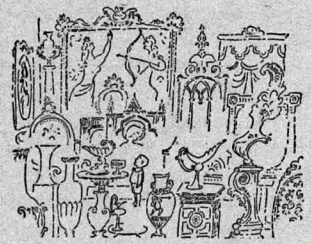

শিল্পী সুনীলমাধব

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

স্বৈরবৃত্ততা সুনীলমাধবের চিত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এবং যে-কোনো শিল্পীর-ই আধুনিকত্ব এই আপেক্ষিক স্বৈরবৃত্ততায়।

সুনীলবাবু ছবি আঁকেন নিজের খুশীমতো, যেমন তাঁর মন চায়। শিল্পশাস্ত্রের আইনমাফিক রেখা আর রং ব্যবহার করেন না, আইন অনুসারে যেখানে ঘন রং ব্যবহার করা উচিত সেখানে ব্যবহার করেন হালকা রং, রেখা যেখানে হওয়া উচিত সরল, সুনীলমাধবের তুলি তাকে সেখানে তির্যক কোরে আনন্দিত। যা দেখেন, তাকে হুবহু কোরে আঁকা তাঁর কাম্য নয়, তাকে ভেঙে, ছিঁড়ে, বিকৃত কোরে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নিজের অন্তর্দৃষ্টির রসে অভিসিঞ্চিত কোরে আঁকা তাঁর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। তাঁর ছবিতে বস্তু স্ফূর্তি লাভ করে অবস্তুর আশ্রয়-ছায়ায়, প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতে ঘটে সংহত সাজুয্য।

ব্যক্তিগত জীবনেও সুনীলমাধব সেন দশজনের মতো বাঁধা-ধরা জীবনযাত্রায় পরাঙ্মুখ। যে স্বাচ্ছল্যের কোলে তাঁর জন্ম, তাতে তিনি, সাংসারিক পরিভাষায়, হয়তো অনেক বড়ো সফল মানুষ হোতে পারতেন, সামাজিক যশ-প্রতিপত্তির অধিকারী হোতে পারতেন, কিন্তু তিনি জাত শিল্পী, সহজাত তাঁর শিল্পপ্রতিভা। এবং তার লক্ষণও দেখা গিয়েছিল ছোটবেলাতেই, ১৯১৯ সালে, ন বছর বয়সে। তখন তাঁরা বাঁকুড়ায় ছিলেন। পাড়ার পূজামণ্ডপে পটুয়াদের তৈরী সুন্দর ও বড়ো একটি হরগৌরী মূর্তি দেখে মুগ্ধ হোয়ে যান কিশোর-শিল্পী। বাড়ী ফিরে এসে তার প্রতিরূপ সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হোয়ে পড়েন। কি করেন, আঁকার সরঞ্জাম তো নেই। এমন সময় চোখে পড়লো একটুকরো কাঠকয়লা। তাতেই সন্তুষ্ট নবমবর্ষীয় কিশোর-শিল্পী। দেয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তুললেন মূর্তির প্রতিরূপ, কিশোর-মনের হরগৌরী। মাতামহ শ্রীহরিনাথ রায় মুগ্ধ হলেন দৌহিত্রের চিত্রনৈপুণ্যে, স্থানীয় জেলাস্কুলের চিত্রশিক্ষক শ্রীঅসিত দাশগুপ্তকে দৌহিত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কয়েক বৎসর তাঁর কাছে শিক্ষালাভ কোরলেন। তারপর ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর অভিভাবকদের কাছে কলকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বাসনা প্রকাশ কোরলেন। অভিভাবকেরা স্বভাবতঃই সম্মত হলেন না। তবু দমলেন না তিনি। গোপনে গোপনে যাতায়াত সুরু কোরলেন প্রখ্যাত শিল্পীদের বাড়িতে। কিন্তু কেউই তাঁকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে রাজী হলেন না, সকলেই পরামর্শ দিলেন শিল্প-বিদ্যালয়ে যেতে।

এমন সময়ে এক বন্ধু তাঁকে সাহায্য কোরতে এগিয়ে এলেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে তিনি শিল্প-বিদ্যালয়ে যেতে সুরু কোরলেন, তৈল-চিত্রাঙ্কনের শ্রেণীতে বন্ধুর এবং আর সকলের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি দেখতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। শিল্পী-অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সিংহ তাঁর উৎসাহ দেখে মাঝে মাঝে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দিতেন, বোঝাতেন। আর বাড়ীতে ফিরে এসে সুনীলবাবু কলেজের পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে ছবি আঁকতেন। এবং পড়া বাদে যখনই সময় পেতেন, সোৎসাহে ছবি আঁকতেন।

আজো তাই। সরকারী অপিসের সারাদিনের কাজের

পাখীওয়ালা।

পর বাড়ী ফিরে এসে প্রয়োজনীয় সময় বিশ্রাম নিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন চিত্রজগতে। রং আর তুলি নিয়ে বসেন। ছবি আঁকেন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই। শুধু ছবি আর ছবি।

সুনীলবাবুর চিত্রশালা চেয়ে দেখার মতো। আশ্চর্য সুন্দর। ঘরময় ছবি। ছোট বড়ো মাঝারি। সর্বত্র ছবি। প্রতিকৃতি, নিসর্গচিত্র, দেশী ও বিদেশী শৈলীতে আঁকা আরও নানাবিধ ছবি। শুধু চিত্রশালা নয়, সমস্ত বাড়ীটাতেই একটা সুরুচির সৌগন্ধ্য ছড়ানো।

তাঁর চিত্রশালায় বেশিরভাগই বিদেশী শৈলীতে আঁকা ছবি। কিছু কিছু প্রতিকৃতিও অবশ্য আছে। বিদেশী শৈলীতে আঁকা চিত্রগুলির অনেকগুলিই বেশ প্রশংসার্হ। আগেই বলেছি সুনীলবাবু চিত্রশিল্পশাস্ত্রের আইনকানুন বিশেষ মানেন না। যেমন তাঁর মন চায়, তেমন কোরে ছবি আঁকেন। বিষয়বস্তুর চাইতে দেখেন, ছবি হিসাবে কেমন হোচ্ছে বা হলো তাঁর সৃষ্টি। তাই বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট কোরে দেন তার নতুন এক প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। যেমন দেখেছিলাম তাঁর চিত্রশালায় প্রায়-সমাপ্ত 'পথচারী বাদক ও নর্তকী'। বাদক হার্মোনিয়মের এক-হাতে রীড টিপে আনন্দে আর-এক হাত উপরের দিকে তুলে দিয়েছে আর উৎসাহিত নর্তকী ফিরে তাকিয়েছে বাদকের দিকে। নিজের সাফল্যে নর্তকী আনন্দিত, তার সাফল্যে বাদক আনন্দিত। উভয়ের চোখে-মুখে অফুরন্ত আনন্দের তীব্রতা ফুটে উঠেছে। সুনীলমাধব তাদের স্বাভাবিক আকৃতিকে অস্বাভাবিক কোরে তুলেছেন। অপেক্ষাকৃত স্থূল রেখায় তাদের প্রতিকৃতি অঙ্কন কোরেছেন। মেয়ে পুরুষের হুবহু প্রতিকৃতি আঁকেননি। কিংবা ধরুন, 'ছাগল' ও 'বাদক' ছবি দুটো। শীতের সকালে পাহাড়ী-ছাগল দুটো পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে। অবসন্ন তাদের গতি। তাদের এই অবসন্নতা ফুটে উঠেছে জ্যামিতিক রেখার বিচিত্র ব্যবহারে; বস্তুত এ-ছবি অনেকগুলি জ্যামিতিক আকারের উপর ভিত্তি কোরে রচিত, যদিও বস্তুর প্রাকৃতরূপ একেবারে বর্জিত হয়নি। 'ছাগলের' মতো 'বাদক' ছবিটিও জ্যামিতিক রূপ ও গড়নের উপর রচিত। দুটি লোক, প্রথমজন বাদ্যের বাহক, দ্বিতীয়জন বাদক। কোলকাতার চীনে শবযাত্রায় এ-ধরনের বাদ্যবাহক ও বাদককে দেখে শিল্পী এ-ছবি এঁকেছেন। এখানে

ছাগল।

লোক দুটির প্রাকৃত রূপ অনেকখানি বিকৃত। কয়েকটি জ্যামিতিক আকারের সাহায্যে শিল্পী তাদের হাত, বুক, পা ইত্যাদি এঁকেছেন। এই লোক দুটি যে কত জীবন্তরকমের বিষণ্ন তা একটু লক্ষ্য কোরলেই বোঝা যায়। মাত্র কয়েকটি রেখার সমন্বয়ে সুনীলবাবুর 'কেশবিন্যাস' ছবিটিও প্রশংসনীয়। বিষয়বস্তু প্রাচীন। অর্থাৎ পুরানো আমলের জনৈকা পুরনারী দর্পণ হাতে কেশচর্চায় রত। তার কাছে দাঁড়ে একটি পাখী (সম্ভবত কাকাতুয়া) বসে আছে। সামনে আছে একটি প্রসাধনসামগ্রী (সম্ভবত সিঁদুরকৌটা)। ছবির সমস্ত পরিবেশটাই প্রাচীন। এ ছবির প্রধান গুণ সারল্য ও নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গী। অন্য ছবির মতো এও জ্যামিতিক গড়নের উপর আশ্রিত। ছবি হিসাবে 'সাঁওতালী মাদল-বাদিকা' আমার সব চাইতে ভালো লেগেছে। কবরীতে লাল মহুয়া, চোখে-মুখে আগুনের শিখার আলো এসে পড়েছে। আর আনন্দে মেয়েটি মাদল বাজাচ্ছে। এ ছবির মধ্যে যে তারুণ্য ও প্রাণোচ্ছ্বাস স্ফূর্ত হয়েছে, তা প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষণীয়। এ-ছবি ঐতিহ্যসিদ্ধ রীতিতে আঁকা নয়, পশ্চিমী ধারায় আঁকা, তবু এতে ভারতীয়ত্ব অন্যান্য ছবির চাইতে বেশিই আছে। অন্যান্য ছবি, 'দুই মুখ' বা 'মা ও ছেলে' ইত্যাদিও জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে অঙ্কিত। জ্যামিতিক গড়নে আঁকা ছবির সব চাইতে ভালো নিদর্শন 'চুম্বন'।

সুনীলবাবুর ছবিগুলি ভালো কোরে দেখলে বোঝা যাবে তাঁর ছবি প্রধানত বিদেশী-প্রভাবিত। বিশেষত পিকাসোকে তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন। তাঁর এই আধুনিকত্বও পিকাসো-লব্ধ। সুনীলবাবু প্রথমদিকে ঐতিহ্যসিদ্ধ বা ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতেই ছবি আঁকতেন। শিল্পবিদ্যালয়ে তিনি আঁকা না শিখলেও, অবনীন্দ্রনাথ,

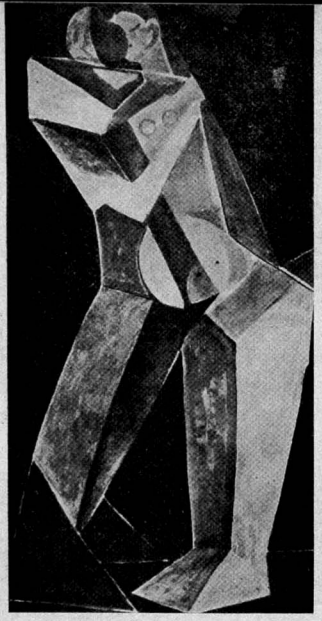

চুম্বন।

পোষাক-পরিচ্ছদ বিদেশী হোলেও ক্ষতি নেই, মনটি যেমন সবসময়ই খাঁটি দেশী হওয়া কাম্য, তেমনি স্থনীলবাবুর প্রকাশভঙ্গী বা রীতি-প্রকরণ বিদেশী হোলেও বিষয়বস্তু দেশী বোলে তাঁর ছবি প্রশংসার্হ। অর্থাৎ অন্যান্য কোন কোন সাম্প্রতিক শিল্পীদের ছবি যেমন সময় সময় বিদেশী শিল্পীর আঁকা বোলে মাঝে মাঝে ভ্রান্তি জন্মায়, স্থনীলমাধবের ছবি সেদিক থেকে দেশী শিল্পীর আঁকা বোলে সর্বদাই চিনতে পারা যায়। তা ছাড়া, তাঁর কোন কোন ছবি পশ্চিমী চিত্রকলার অনুকরণ হোলেও তা দৃষ্টিকটুরকমের হুবহু অনুকৃতি হয় না। দেশী ও বিদেশী চিত্রকলার সার্থক সমন্বয়ে বিশিষ্ট স্থনীলবাবুর আবেদন-সুন্দর সাম্প্রতিক ছবিগুলি এক কথায় সত্যই অভিনন্দনযোগ্য, প্রশংসনীয়।

পশ্চিমী চিত্রকলায় সাম্প্রতিক অনেক শিল্পীই প্রভাবিত। কারো কারো মধ্যে এই প্রভাব বেশি রকমের স্পষ্ট। এঁদের

সাঁওতালী মাদল-বাদিকা।

নন্দলাল ও অতুল বসুর মতো প্রখ্যাত শিল্পীর সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন; তাঁর প্রাথমিক ও শেষ শিক্ষাও এঁদেরই কাছে। এ-হেন শিল্পীদের কাছে যাঁর শিক্ষা, তাঁর ছবিতে নৈপুণ্য ও বিশিষ্টতা একদিন না একদিন আসবেই। তাই স্থনীলবাবুর প্রথম দিককার ছবিতে এঁদের প্রভাব স্পষ্টীকৃত হোলেও, পরবর্তীকালে ও সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ছবিতে একটা আশ্চর্য স্থনিপুণ স্বকীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত। সাহসী রেখা আর ঘন উজ্জ্বল রঙের এবং পটভূমির বিচিত্র ব্যবহারে আজ তাঁর ছবি তাঁর নিজস্বতায় বিশিষ্ট, ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ প্রতিভায় ভাস্বর।

বিদেশী চিত্ররীতি-প্রভাবিত হোলেও স্থনীলবাবু সম্পর্কে প্রশংসার কথা এই, তাঁর অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুই ভারতীয়। এবং বিদেশী ছবি যেমন, বাংলার লোকায়ত চিত্রসমূহও তাঁকে বহুল প্রভাবিত কোরেছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে

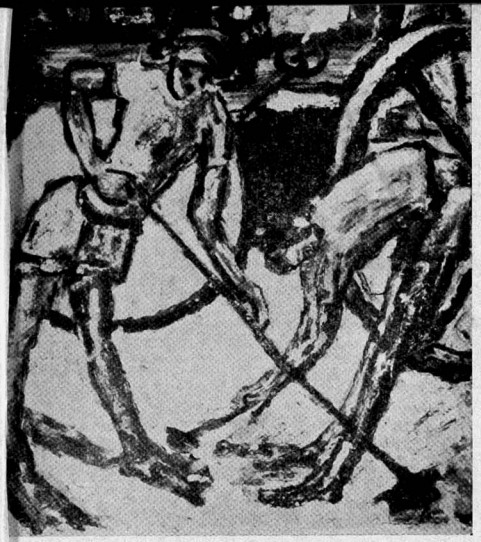

শ্রমিক।

(বাঁ পাশের 'শ্রমিক' নামের ছবিটির সঙ্গে সাম্প্রতিক শিল্পীর আঁকা কোনো ছবির ছায়া দেখা যায় কি?

—হয়তো যায়, হয়তো যায় না।

কিন্তু যদি আর কারো আঁকা ছবির সঙ্গে উপরোক্ত ছবির মিল কেউ দেখে থাকেন, তবে তাতে দোষের কিছু কি আছে?

সে রকম মিল তো সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর, সকলের সঙ্গে সকলের। তাতে আপত্তিটা কোথায়?)

অনেকের কাজের সঙ্গে স্থনীলবাবুর কাজের সাদৃশ্য বা সারূপ্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। এবং এ-জন্য স্থনীলবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কবি সাহিত্যিক বা চিত্রকরের মধ্যে গোষ্ঠিপ্রিয়তা অত্যাশ্চর্য কিছু নয়। সাধারণত শিল্পীরা প্রত্যেকেই পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত, প্রত্যেকেই দলগতভাবে মহৎ কীর্তির সৃষ্টিতে উন্মুখ, তৎপর। অবশ্যই যুগন্ধর লোকোত্তর প্রতিভার কথা বাদ দিয়ে বোলছি। তবুও সে-ধরনের প্রতিভা প্রথমে কারো না কারো দ্বারা প্রভাবিত হন, পরে অবশ্য অনন্য-সাধারণত্বে চিহ্নিত হয় তাঁর সৃষ্টি। সাম্প্রতিক বাংলা চিত্রজগতে পশ্চিমী ধারার যে অনুস্থতি চলছে (কোথাও বা অনুকৃতি) স্থনীলমাধবের ছবিতে তারই স্বাক্ষর বর্তমান।

স্বৈরবৃত্ততা এই আধুনিক শিল্পীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁরা যেমন খুশী তেমন ছবি আঁকেন। এর মানে এই নয় যে তাঁরা অর্থহীন ছবি আঁকেন। এর মানে এই যে ছবির ছবিত্বটুকুর দিকে পুরো নজর থাকে তাঁদের, ফলে সময় সময়

দুই মুখ।

বাদক।

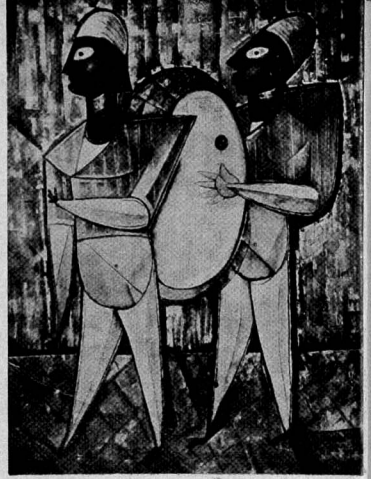

তাঁদের ছবি আঙ্গিকসর্বস্ব হোয়ে যায়, নিষ্প্রাণ মনে হয়। কবিতার বেলায় ছন্দ, মিল, অনুপ্রাস, উপমা, এদের কোন একটি যেমন সব নয়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সবগুলির সু-সামঞ্জস্যে সৃষ্টি হয় সার্থক কবিতার, ছবিতে তেমনি রেখা বা রঙের নিপুণ ব্যবহার, আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য, কম্পোজিশনের যাথার্থ্য ইত্যাদি সব নয়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সবগুলি সমান-ভাবে সংযোজিত হোলেই সার্থক চিত্র জন্মলাভ করে। স্থৈরবৃত্ততার সঙ্গে শৃঙ্খলার মিলনেই সৃষ্টির সার্থকতা। সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিকত্বের ঐ জাতীয় দোষ সুনীলবাবুর ছবিতে খুব একটা নেই।

সুনীলবাবুর ছবি গদ্যকবিতা। গদ্যের ঋজুতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছে কবিতার লালিত্যের। রেখা আর রং, পারস্পেকটিভ আর কম্পোজিশন, আলো আর ছায়া একটি

(শিল্পী সুনীলমাধব সেনের 'কেশবিন্যাস' এই রেখা-চিত্রটিতে 'পট'-এর লক্ষণ কি পরিস্ফুট নয়?

পটুয়ার সঙ্গে পিকাসোকে একই পংক্তিভোজের আহ্বান কোরেছেন যেন আমাদের শিল্পী!)

কেশবিন্যাস।

আশ্চর্য সামঞ্জস্যে বিধৃত। গদ্যকবিতার আপাত-ছন্দোহীনতায় যেমন একটা যতি আছে, সুনীলবাবুর ছবির আপাত-অ্যাসিমেট্রিতে তেমনি ধরা পড়ে একটি সুন্দর সিমেট্রি। এ সিমেট্রি অনেক সাধনা, অনেক অনুধ্যানের ফলশ্রুতি। বাঁধা-ধরা শিক্ষাপ্রণালীতে অশিক্ষিত সুনীলমাধবের পটুত্ব তাই বাঙালী পটুয়াদের মতোই নির্ভেজাল, স্বয়ংসিদ্ধ।

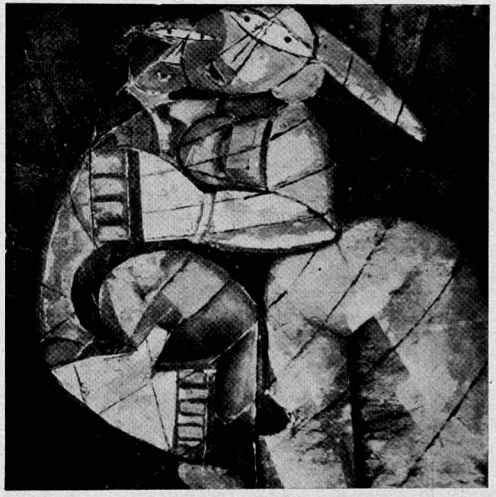

। মা ও ছেলে।

আকাশ
বা
জলরঙে ধোয়া কাগজের ধূসর গা

একই কথা
যথা
হিজিবিজি কত কি
যত কি
মেঘের ঢঙ
নানান রঙ
তার-ই গীতালি
আকাশ ও কাগজে
হৃদয় ও মগজে
মিতালি

আকাশ
বা
জলরঙে ধোয়া কাগজের ধূসর গা

ক্যুবার একটি কবিতার ভঙ্গীতে

শিল্পাঞ্চল টোকিয়ো

দীপঙ্কর রায়

জাপানে প্রায় দেড় বছর হলো এসেছি। জাপানের মধ্যমণি টোকিয়ো শহরে অবস্থান কোরছি। টোকিয়ো এবং তার আশপাশের শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে দু-একটি কথা লিখতে বসেছি।

শহরটি নাকি পৃথিবীর বড় শহরের মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ১৯৪৭ সালে ছিল সাড়ে চৌত্রিশ লক্ষ, এখন হোয়েছে প্রায় ৮৩ লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বসতবাটী ছিল ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার, যুদ্ধের প্রয়োজনে ভেঙে দেওয়া হোল ৭ লক্ষ ৮ হাজার ; এখন বাড়ির সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার। জাপান সরকারের হিসাবে অন্তত আরও ৪ লক্ষ বাড়ী চাই।

এখানে মৃত্যুর হারের চেয়ে জন্মের হার বেশি। জন্ম হয় প্রতি সাড়ে তিন মিনিটে একজন, আর মরে প্রতি দশ মিনিটে একজন।

কৃষি ও শিল্প এদের প্রধান উপজীবিকা। এখানের অধিবাসী পরিশ্রমে কাতর নয়, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সবাই ব্যস্ত। এদের শালীনতাবোধ ও শৃঙ্খলাবোধ বাইরের জগতের লোকের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই ব্যস্ততার মধ্যেও, জীবিকার্জনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম সত্ত্বেও এদের সৌন্দর্যবোধ একটুও কমেনি। জীবনের সঙ্গে দু-হাতে লড়াই করা এদের পক্ষে বোধহয় এত সহজ হোয়েছে, কারণ এদের সমস্ত সময় ভরে আছে শিল্পৈষণার সৌরভে। এবং শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই সৌন্দর্যবোধ বিশেষ কোরে বিকাশ পেয়েছে। যে কোন ছোট-খাট জিনিষ তৈরীতেও চারুকলার ছোঁয়া আছে। এদের বড় কারখানার চেয়ে ছোট কারখানার সংখ্যা ঢের বেশি। আবার বড় কারখানা যত বড়, ছোট কারখানাও বোধহয় তত ছোট। কাওয়াজাকির একটি লোহার কারখানা প্রায় ৩৬ লক্ষ বর্গগজ জুড়ে। ছোট কারখানা তো অসংখ্য, ঘরের দাওয়ায় দাওয়ায়, আঙিনায় আঙিনায়।

জাপানের একটি প্রধান শিল্পাঞ্চল হোল 'কিহিন'। এখানে প্রায় ৬০০ ছোট-বড় কারখানা ; আধুনিক উন্নত প্রথায় শিল্পোৎপাদন হয়। টোকিয়ো এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল।

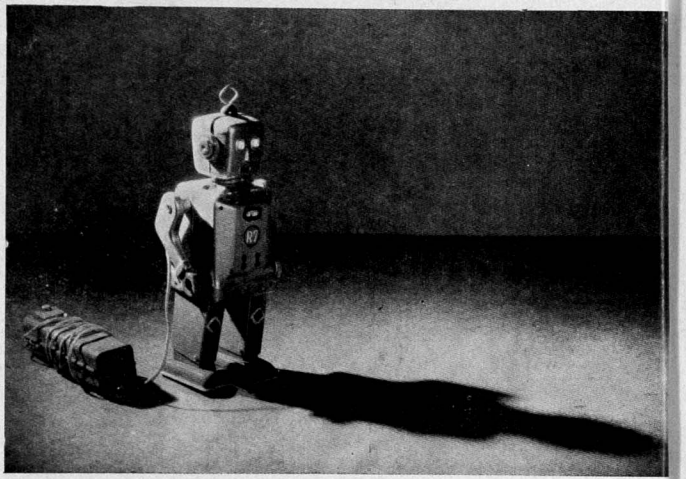

লেখকনির্মিত ব্যাটারি-চালিত কলের মানুষ।

এখানে তৈরী হয় না এমন জিনিষ বোধহয় নেই। খাদ্যদ্রব্য থেকে সুরু কোরে জাহাজের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সবই এখানে তৈরী হয়। বিদ্যুৎশক্তি ও কয়লার গ্যাস সরবরাহ-ব্যবস্থা ক্রমেই বাড়ছে।

কৃষি ও শিল্পসংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য নানারকমের সংস্থা আছে, যথা: Central Bank for Commercial and Industrial Co-operatives, Central Co-operative Bank for Agriculture and Fishery, Smaller Enterprises Finance Corporation, Peoples' Finance Corporation ইত্যাদি। শিল্পসংস্থাগুলিকে সাহায্য কোরবার জন্য ডিজাইন, কারুকলা, যান্ত্রিক পরীক্ষা প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা আছে। বিদেশ থেকে ডিজাইন নিতে বা বিশেষজ্ঞ আনাতে এদের কোন আপত্তি হয় না, বরং এরা তাকে অভিনন্দিত করে।

জাপানে জীবনযাত্রা খুব ব্যয়বহুল, অথচ অধিবাসীরা

লেখকনির্মিত কুকুর-ছানা। ইনিও ডাকেন।

তুষ্ট হয় স্বল্প আয়েই, এদের যেন সবার লক্ষ্য কত তৈরী জিনিষ বিদেশে রপ্তানী কোরে দেশকে সমৃদ্ধ কোরবে। এত বাড়ীর অভাব, তবুও এরা সিমেন্ট রপ্তানী করে। জাহাজের যন্ত্রপাতি তো এদের একটি বড় রপ্তানীর জিনিষ। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি বোধহয় এদের তৈরী খেলনা। খেলনাগুলি শুধু যে মনোহারী তা নয়, নিত্য নতুন ডিজাইন, নিত্য নতুন উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন ধরনের উৎপাদনের চেষ্টা।

সম্প্রতি খেলনাতে এরা ব্যবহার কোরছে ছোট ব্যাটারী, যা আমরা কোরে থাকি টর্চ বাতিতে। ব্যাটারী দিয়ে চাবির বদলে খেলনাগুলিকে চালনা করা হয়। আমেরিকাতে এই খেলনার খুব আদর। আমেরিকার বাজারে বিদেশ থেকে রপ্তানী খেলনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী থেকে। খেলনা তৈরীতে নিত্য নতুন ডিজাইনের, রঙের, কারুকলার প্রতিযোগিতা।

খেলনা তৈরীর কোন বড় কারখানা নেই, সবই ছোট ছোট কারখানায় তৈরী হয়। সম্প্রতি লণ্ডনে বিভিন্ন দেশের

। আরেকটি কলের মানুষ বা রোবোট।

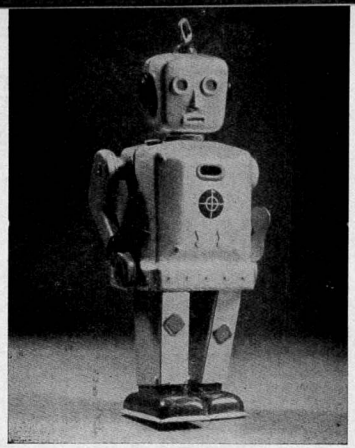

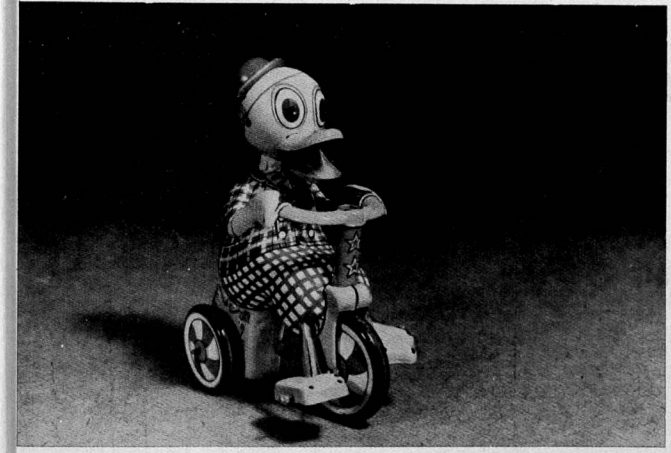

লেখকনির্মিত ত্রিচক্রযানে উপবিষ্ট কলের পুতুল।

তৈরী খেলনার প্রদর্শনীতে জাপানে তৈরী একটি প্লেন-খেলনা প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

খেলনা তৈরীর ব্যাপারে তার চমকপ্রদ যান্ত্রিক কলা-কৌশলের দিকে যেমন নজর দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেটার ডিজাইনের সৌন্দর্যের দিকে সমান মনোযোগ দেওয়া হয়। কোন রংটি, কোন ধাঁচটি কোথায় লাগালে ভালো হবে তা খুবই চিন্তা কোরে করা হয়।

ডিজাইন শেখার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। জাপানী ভাষা জানলে ছ' মাস থেকে এক বছরের মধ্যে শেখা যায়। খেলনার একটি কুকুর-ছানা তৈরী করার সময় তার ডাক থেকে আরম্ভ কোরে তার চলনভঙ্গী তার লেজ নাড়া, রং চেহারা সব কিছুতেই নিখুঁত স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা করা হয়। শুধু খেলনা নয়, তার প্যাকিং বাক্সটিতে পর্যন্ত কারুকলার পরিচয় থাকে। যান্ত্রিক শিল্পের মাধ্যমে আর্টের এই সাধনা অনবদ্য।

টোকিয়ো শহরটি তার নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকে যেমন মনোরম, তার অধিবাসীদের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিও তেমনি মনোরম। জাপানের ভূ-প্রকৃতিতেও যেমন রঙের খেলা, এদেরও বসনে-ভূষণে তেমনি রঙের বৈচিত্র্য।

এই একটি দেশ, যেখানে স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরিশ্রমী, সকলেই স্বল্প আয়ে তুষ্ট, দেশপ্রেমে একনিষ্ঠ, সৌন্দর্য সাধনায় বিশেষরকমের আগ্রহশীল এবং পরিপুষ্ট ও প্রাণবান।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরিণয়ের আধুনিকতম পুরোহিত জাপান বাইরের জীবনযাত্রায় প্রতীচ্যভাবাপন্ন হোলেও ঘরে খাঁটি দেশী। ঘরের সঙ্গে বাইরের এমন সুন্দর সমন্বয় কোরতে পেরেছে বোলেই ঘরে-বাইরে জাপান আজ আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হোয়েছে পূর্বমর্যাদার পরিপূর্ণতায়।"

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেব মাণিক্য।

ত্রিপুরা ভূখণ্ড ও তার অধিবাসী

রামমণি

অনিশ্চিতভাবে আসামের দাঁড়ের ওপর ভর কোরে ত্রিপুরা যেন কাজু বাদামের মতো পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

চারহাজার-এক বর্গমাইলের ভূমিখণ্ড এবং উপত্যকা পাকিস্তানের সমতলভূমির সঙ্গে মিশে গেছে—মাঝে প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশের কোন চিহ্নও নেই।

সাতশো পঞ্চাশ মাইলের কৃত্রিম সীমারেখা, আত্মীয় বন্ধু থেকে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন কোরে রেখেছে। এই কৃত্রিম রেখা ভেদ কোরে হাজার হাজার লোক এদিকে আসছে। কেউ বাস্তুহারা হিসাবে—কেউ আইনসংগত অনুমতিপত্র ও ভিসা নিয়ে। অনুমোদিত সড়কের সংখ্যা কম, বাধা দেওয়ার ঘাঁটিও হাতে গোণা যায়, মাইলের পর মাইল জঙ্গল ও পায়ে চলার পথ দুই দেশে ছড়িয়ে আছে। জীপ নিয়ে গেলে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে আসা যাবে না। কারণ—পাকিস্তানের জমিতে পড়তে হবে, দক্ষিণদিক দিয়ে এলেই নিশ্চিন্ত, সেদিকে ভারতের সীমারেখা।

কিছু আদিবাসী, যারা জঙ্গল পুড়িয়ে জমিতে চাষ-আবাদ কোরেছিল তাদের পাকিস্তান সীমারেখা অতিক্রম করার জন্যে বন্দী করা হোয়েছিল। দুই দেশের মহকুমা-হাকিমদের প্রায় দশ দিন লেগেছিল সীমারেখার খুঁটিগুলি আবিষ্কার করতে এবং সীমারেখার চিহ্নিত কোন অংশের তারা চাষ কোরছে তা নির্ধারণ কোরতে। গড়ে একহাজার ফিট উঁচু পাঁচটি পাহাড়ের সারি উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে প্রসারিত

। ত্রিপুরা-রমণীর বিচিত্র বস্ত্রাবরণীর একটি প্রাচীন নমুনা।

হোয়েছে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টি চারহাজার ফিট। এছাড়া বাকিটা সমতলভূমি, এখানে-সেখানে দু-একটা ছোট পাহাড় আছে।

উপত্যকার জমিকে 'লুঙ্গা' বলে—ছোট বা উঁচু পাহাড় 'টিলা' নামে পরিচিত। উপত্যকার জমি উর্বর, সাধারণ চাষী লুঙ্গা চাষ করতে শিখেছে, এখানে ধান ও পাট প্রচুর পরিমাণে হয়। উঁচু জমির গড়ানো জায়গায় চাষ হয় না। এইসব ঢালু জায়গায় ফলের গাছ লাগাবার চেষ্টা হোচ্ছে।

আদিবাসীরা প্রধানত 'জুমিয়া', বিশেষ কোরে যারা জায়গা বদলে চাষ করে।

তারা প্রথমে জঙ্গল পোড়ায়, তারপরে নিড়ানি দিয়ে বীজ বপন করে।

কয়েক বছর পরে তারা সে জমি ছেড়ে যায়, আবার ঘন বনের বিস্তৃতিতে সে জায়গা ঢাকা পড়ে যায়।

প্রচুর বাঁশবনের সারি এইভাবে গড়ে ওঠে। বন পুড়িয়ে দিলেও আবার বাঁশের অঙ্কুর গজায়।

একসময় এখানে প্রচুর আখ জন্মাতো, কিন্তু এখন আর তেমন হয় না।

গভীর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এখনও আখ গাছের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রচুর শাল গাছ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুন খুব কম।

সরকারী বনবিভাগ বড় বড় ভূখণ্ডে শাল গাছ জন্মাবার চেষ্টা কোরছে। জ্বালানি কাঠের গাছের সংখ্যা অনেক। হারগুজা, আওয়াল এবং সোনাল গাছ সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে নারিকেল, বাদাম বা আঙুরের গাছ নেই। ভিজে মাটিতে প্রচুর কলা গাছ হয়, বছরে প্রায় আশি নব্বই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

পাহাড়ের ভেতরের জমিতে অনেক কমলালেবু জন্মায়, আনারস সব জায়গায় হয়, কিন্তু যানবাহনের সুবিধা না থাকাতে বিক্রির বাজার নেই।

সময়মত একটাকায় পঞ্চাশ বা একশত আনারস পাওয়া যায়, আর কোলকাতায় একশত আনারসের দাম পঞ্চাশ টাকা।

ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন। কোলকাতা, গৌহাটি, শিলচর, মনিপুরের সঙ্গে দৈনিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

আমাদের নিত্য ব্যবহারের প্রধান জিনিষগুলো আধুনিক যানের সাহায্যে অত্যধিক ব্যয়ে সরবরাহ হোয়ে থাকে।

লবণ, সাবান, ঔষধপত্র বিমানে আমদানী হয়, পাট, তুলো বিমান যোগে কোলকাতার মিল-এ চালান দেওয়া হয়।

ভারতে বোধ হয় ত্রিপুরা একমাত্র জেলা যেখানে বিমানের সাহায্যে মহকুমায় যাওয়া আসা কোরতে হয়।

অল্পদিন হলো আসাম-আগরতলা বিখ্যাত সড়ক খোলা হোয়েছে।

কিন্তু এ রাস্তা শুধু জলবৃষ্টির দিন ছাড়া ব্যবহার করা চলে। সেতুগুলো অস্থায়ী, প্রথম বর্ষা সুরু হোলে ধুয়ে মুছে যায়, কোন চিহ্নমাত্র থাকে না। ভারত ও আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগসূত্র এখনও দুর্বল। বৃষ্টির গতির ওপর নির্ভর কোরতে হয় কারণ তখন রাস্তায় পাহাড় থেকে ধস নামে, সেতু জলে ভেসে যায়। মেঘ, বজ্রপাত, ঝড়ের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় কারণ তখন যাত্রীবিমান চলাচল বন্ধ রাখা আবশ্যক হোয়ে পড়ে।

ত্রিপুরার নদীগুলো উত্তর এবং পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে পাকিস্তানের অভিমুখে ; দেখতে সংকীর্ণ, অগভীর এবং শান্ত মনে হয়, কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে আক্রোশে ফুলে ওঠে, প্লাবনের স্রোতে মাইলের পর মাইল ভাসিয়ে দেয়, জনপদ, ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকে না, শত শত লোক নিরাশ্রয় গৃহহীন হয় ; তারপর একে-বেঁকে নরম উর্বর জমি গড়ে তোলে।

সাধারণ লোকের একবাড়ি থেকে অন্যবাড়ি নৌকায় যাতায়াত অভ্যাস হোয়ে গেছে। একরাত্রের মধ্যে ঘরবাড়ি শূন্য কোরে পালিয়ে যাওয়া, তাও যেন তাদের অভ্যাসগত মনে হয়। চোখের ওপর দেখছে তাদের ঘরবাড়ি ধানক্ষেত নিশ্চিহ্ন হোয়ে যাচ্ছে, যে মাঠে একদিন ধানের বীজ বুনেছে সেখানেই হয়ত মাছ ধরার জন্যে জাল মেলে ধরেছে। দোকানঘর ভেসে গেছে, দোকানদার বিচিত্র জাল দিয়ে মাছ ধরতে সুরু করেছে। ত্রিপুরায় রাস্তার সংখ্যা কম, বর্ষার সময় নদীপথে যাতায়াত চলে না। দুরন্ত গতিতে গাছপালা ভেঙে নদী ছুটেছে, এর মধ্যে নৌকা চালানো বিপজ্জনক। বাঁশের ভেলা কিংবা চ্যাপ্টাতলার নৌকা বর্ষা বাদে অন্য সময়ে যাতায়াত করে।

বাঁশের ভেলায় কোরে বাজারের জিনিষ সওদা করা হয়। পাহাড় থেকে পাট, তুলো, কমলালেবু, আনারস নীচে আনা হয় আর নীচ থেকে নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী ওপরে নেওয়া হয়।

সরকার বর্তমানে বড় বড় সড়কগুলি নির্মাণের কথা চিন্তা কোরছেন।

আগরতলার পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বদিকে অবস্থিত কাছার জেলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্যে একটি পাকা রাস্তা, ঝড় বাতাস সহ্য করার মতো মজবুত সেতু তৈরী হোচ্ছে। দক্ষিণে সবরুমের দিকে আগরতলা থেকে একটি রাস্তা প্রসারিত হোয়েছে।

। বয়নকার্যে ব্যাপৃত ত্রিপুরাই মহিলা।

গ্রামের রাস্তা তৈরী করার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে খুব উৎসাহ এবং উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক গ্রামেই সদর রাস্তা থেকে জিপ চলার মতো রাস্তা নির্মাণের আগ্রহ আছে। কেউ কেউ আধা-পাকা সেতুও নিজেদের চেষ্টায় তৈরী কোরে ফেলেছে। পাশের চা-বাগানের মালিকরা গ্রামের কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্যে কাঠ সরবরাহ কোরেছেন। আগরতলা থেকে একজন বিশিষ্ট অতিথির আগমন উপলক্ষ্য কোরে গ্রামবাসীরা তার আগমনের পূর্বেই রাস্তা তৈরী সম্পূর্ণ করার আগ্রহ প্রকাশ কোরেছে।

মহকুমা-হাকিমকে যতবেশি সম্ভব পেট্রোম্যাক্স আলোর ব্যবস্থা কোরতে হোয়েছে, গ্রামবাসীরা সমস্ত রাত গান গেয়ে রাস্তার কাজ শেষ কোরেছে। মেয়েদের হুলুধ্বনি, সোরগোল পড়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের স্ফূর্তিতে চীৎকার, ছুটোছুটি, হৈ-হুল্লোড়ে, গ্রামের গরু ঘাস খাওয়া ভুলে উৎসুক হোয়ে তাকিয়েছে, বানরেরা এ-গাছ থেকে ওগাছে লাফালাফি কোরেছে। একখানা জীপ প্রথম গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু কোরেছে। সে এক স্মরণীয় দিন।

গ্রামের মোড়লরা সরকারী কর্মচারীকে ঘিরে তাদের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছে। কয়েকটি কালভার্ট হোলে আরও দু-খানা গ্রামকে রাস্তার সুযোগ দেওয়া যায়। তারা স্কুলবাড়ি তৈরী কোরেছে, তার জন্যে শিক্ষক চাই। নলকূপ চাই, কুয়ো চাই। পুকুরের জল অপরিষ্কার, নোংরা এবং গ্রাম থেকে অনেকদূরে। তাদের অভাব অভিযোগের সারাংশ প্রধানত গ্রামের পথঘাট, শিক্ষা এবং গ্রামের স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র কোরে। মিশ্রিত জাতির সমাবেশে ত্রিপুরার জনপদ গড়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালের লোক গণনার হিসাবে ত্রিপুরার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার—১৯৫৬ সালে হয়ত আরও কয়েক লক্ষ বেড়েছে, বাড়তির মধ্যে সবই প্রায় বাস্তহারা, বাকি কিছু ত্রিপুরার আদিবাসী,—হালাম, রেয়ং, চক্‌মা, মগ শ্রেণীর। আদিবাসীদের নিজেদের ভাষা আছে। কিন্তু প্রধান চল্‌তি ভাষা বাংলা। অনেকদিন ধরে আদালতের ভাষা বাংলা চলে আসছে। আদিবাসীরা যখন শিক্ষার বিষয় চিন্তা করে তখন তাদের বাংলায় শিক্ষাপ্রণালীর কথাই মনে হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই 'জুম্'প্রথায় ঘুরে ঘুরে জমি চাষ কোরে জীবনধারণ করে।

ধীরে ধীরে বনকে ধ্বংস করা হয়, মাটির ওপরের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে ফেলা হয়।

যাদের জমি আছে তারাও ঘুরে ঘুরে চাষ করে, কারণ এতে পরিশ্রম কম। এদের উপযুক্ত চাষের জমি দিয়ে স্থিতি করার ব্যবস্থা হোচ্ছে, চাষের গরু, লাঙল ও বীজ কেনার জন্যে টাকা ও দেওয়া হোচ্ছে।

ত্রিপুরায় এখন অনেক কাজ —মাইলের পর মাইল রাস্তা তৈরী কোরতে হবে, নদীতে বাঁধ দিতে হবে, আদিবাসীরা এসব কাজে অভ্যস্ত নয়, দক্ষ কারিগর নয়; মজুর হিসাবে কাজ কোরতে রাজী নয়। তারা হয়ত একবেলা খেয়ে থাকবে আর তাদের চোখের সামনে গ্রামের রাস্তা তৈরী কোরছে বিদেশী মজুরেরা।

কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হোয়েছে। কয়েকমাসে তারা নিজেদের চেষ্টায়ই পাঁচমাইল রাস্তা তৈরী কোরেছে।

এখন আবার একটি দুর্গম অঞ্চলকে সহজ সুগম করার জন্যে তারা বারো মাইল রাস্তা নির্মাণ কোরে প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত কোরছে। খরচের অর্ধেক অংশ সরকার বহন কোরছে এবং গ্রামবাসীদের হাতে দিচ্ছে।

ত্রিপুরার বিখ্যাত গোমতীনদীর খেয়াঘাট।

॥ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ

ত্রিপুরায় প্রায় তিনলক্ষ বাস্তহারা আছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই কৃষকশ্রেণীর, কিছু ব্যবসায়ীও আছে।

সরকার একচল্লিশটি কলোনি গঠন কোরেছেন, কলোনির বাইরে যেসব বাস্তহারা আছে, সরকার প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব হোয়েছে।

এখন মাসে গড়ে দু-হাজার বাস্তহারা ত্রিপুরায় আসছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্যে জমি সংগ্রহের চেষ্টা হোচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ওস্তাদ চাষী আছে যারা নিজেদের চেষ্টায় জমি সংগ্রহ কোরে চাষ-আবাদ সুরু কোরেছে। অনেকে আবার নিজেরা পারেনি, তাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এছাড়াও কিছু সংখ্যক বাস্তহারা আছে যাদের নিয়ে সরকারের সমস্যা বেশ কিছুদিন থাকবে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বাস্তহারা পরিবারের অর্ধেক অংশ পাকিস্তানে রয়ে গেছে, বাকি অংশ ত্রিপুরায় এসেছে। তরুণ তরুণীরা চলে এসেছে, বৃদ্ধরা পাকিস্তানে পড়ে আছে।

ত্রিপুরায় জরিপের কাজ হয়নি, প্রজাসত্ব আইনও অনেক প্রাচীন।

মহারাজার সময়ে লোকের অনুপাতে জমি বেশি ছিল। চাষীদের অনুর্বর জমি চাষের যোগ্য কোরে তোলার জন্যে গছিয়ে দেওয়া হতো। কেউ আবার বেশি জমি আবাদের উপযোগী করার জন্যে ক্ষেপে যেত এবং সেজন্যে তারা বেশি জমি নিজেদের দখলে রাখত।

সেইজন্য দেখা যায় কেউ হয়তো দশ একর জমি বাসের উপযোগী কোরে বাস কোরছে, কিন্তু তার দখলে রেখেছে একশত একর; সীমানির্দেশের চিহ্নও অস্পষ্ট, যেমন একটা গাছ কিংবা ছোট পাহাড়ের টিলা কিংবা ছোট নদী। এইসব দিয়ে লোকের জমির সীমানা ঠিক করা হোয়েছে। গ্রামের কোন সীমানা ঠিক করা নেই। কর-আদায়ের হারও সমান নয়, কারও কাছে বেশি কারও কাছে কম আদায় হোচ্ছে, জুমিয়াদের বাস্তুভিটার জন্যে খাজনা দিতে হয়। খাজনার হার প্রত্যেক মহকুমায় বিভিন্ন। প্রজাসত্ব আইনের পরিবর্তন করা হোচ্ছে।

একটি রিয়াং আদিবাসী।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্য বক্ষাবরণের একটি পুরানো নক্‌শা।

ত্রিপুরায় ব্যবস্থাপক সভা বা আইনপরিষদ নেই; সুতরাং প্রত্যেকটি আইন এবং তার সংশোধন মন্ত্রণাসভা বা মহাসভা (পার্লামেণ্ট) কর্তৃক বিবেচিত এবং অনুমোদিত হয়।

ত্রিপুরা জেলা ছোট বড় দশটি মহকুমায় বিভক্ত। সচরাচর একটি জেলায় তিনটি মহকুমা থাকে। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশ অগম্য বিধায় বেশি সংখ্যক মহকুমা বা সদর কার্যালয় করা আবশ্যক হোয়েছে।

তহশীল কার্যালয় থেকে কোন কোন মহকুমায় যেতে এখনও তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লাগে। হাতী কিংবা পায়ের সাহায্য ছাড়া চলার উপায় নেই। ঘোড়া তো পাওয়াই যায় না, দু-একটা টাট্টু ঘোড়া মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

গরুর গাড়ী এর আগে বিশেষ দেখা যায়নি, রাস্তা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা এখন দেখা যাচ্ছে।

কাঁচা রাস্তা গরুর গাড়ী চললে নষ্ট হোয়ে যায়। ডাক এখনও জীপগাড়ী ও ডাকহরকরার সাহায্যে বিতরণ করা হয়। চারটি মহকুমায় বিমান চলাচল করে, অনেক ক্ষেত্রেই চিঠি লিখতে জানার লোক নেই।

আদিবাসীদের মধ্যে ক্রমশ কিংবদন্তীর প্রভাব দূর হোয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরীদের নিজস্ব নৃত্য বা সংগীত বোলে কিছু নেই। রিয়াং সম্প্রদায় তাদের নৃত্য এবং সংগীত বজায় রেখেছে।

পুরুষেরা বাঙালীদের মতো কাপড় পরে, নারীদের পোষাক অনেকটা অজন্তা ধরনের। যারা সহরের কাছাকাছি থাকে তারা শাড়ী পরে।

ত্রিপুরায় অনেক মুসলমানের বাস। তারা দেশ-বিভাগের আগে থেকেই আছে। অনেকে পাকিস্তান থেকে এসেছে ত্রিপুরায় পাকাপাকিভাবে বসবাস কোরবে বোলে।

ত্রিপুরার মহারাজার ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও ঠিক ত্রিপুরার সমান রাজ্য ছিল। সেইসব রাজ্যের প্রজাদের ত্রিপুরাতেও জমি ছিল। তারা অধিকাংশই মুসলমান, 'জিরাতিয়া' নামে পরিচিত। তারা এখন সবাই পাকিস্তানী হোয়ে গেছে, কিন্তু এখনও ত্রিপুরাতে তাদের জমি আছে।

ত্রিপুরায় সমস্যার শেষ নেই কিন্তু ত্রিপুরাকে সমস্যাসংকুল প্রদেশ বোললে ভুল করা হবে।

প্রত্যেক কাজের লোকের কাছে ত্রিপুরা অনাঘ্রাত, অপরিচিত, কোন কাজই সহজে নিষ্পন্ন হবার নয়। পাহাড়-প্রমাণ বাধা হয়তো পথ রোধ কোরে দাঁড়ায়, কিন্তু তাও অতিক্রম করা যায়।

সাধারণ অধিবাসীরা সহজ, সরল। ত্রিপুরাকে যারা ভালবাসে তাদেরই তারা সাদরে গ্রহণ করে অন্তরের প্রীতি দিয়ে। এখানে কোন কিছু চেষ্টা করা মূল্যহীন হয় না, পরিশেষে সার্থক হোয়ে ওঠে।

শিল্পের রাজ্যে ত্রিপুরা

❖

নৃপেন্দ্র সান্যাল

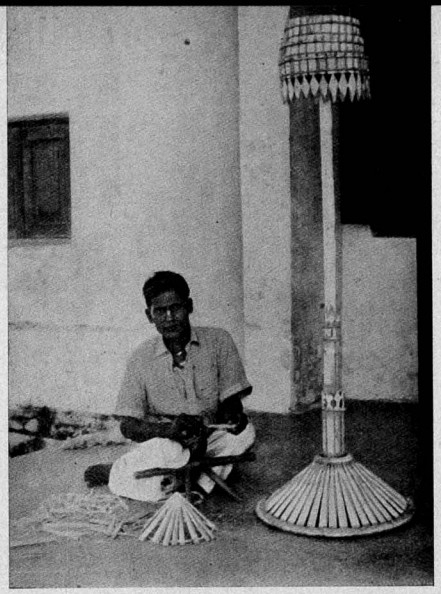

রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর প্রদত্ত নক্‌শা অনুযায়ী জনৈক কারিগর কর্তৃক নির্মীয়মান বাঁশের একটি দীপস্তম্ভ বা ল্যাম্পষ্ট্যাণ্ড। বাঁশের কারুকাজে ত্রিপুরা পূর্বভারতের দেশসমূহের মধ্যে অগ্রণ্য।

কোলকাতা থেকে আগরতলা। প্লেনে মাত্র একঘণ্টা লাগে। কিন্তু এই একঘণ্টার ব্যবধানে মনে হবে নতুন দেশে এলাম। নতুন পরিবেশে। চারিদিকের সবুজ, বড় বড় গাছ, দিঘি। বাঁধানো সুন্দর রাস্তা সহজেই মনে কোরিয়ে দেয়, অনেক দিনের চেষ্টায় গড়ে ওঠা শহরটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক রুচিবান শিল্পীমনের চিহ্ন। আগরতলা আগে ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানে সদর শহর। ত্রিপুরা নামের সঙ্গে যেমন অনেক কালের অনেক ইতিহাস ও শ্রুতি জড়িত, তেমনি আগরতলার নামের সঙ্গেও। আগরতলায় পৌঁছলেই মনে হবে ত্রিপুরার জীবনধারার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত হোলাম।

'আগরতলা' নাম নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা এখানে অনেক 'আগর' (অগুরু) গাছ ছিল বোলে আগরতলা নাম হোয়েছে। আবার 'রাজমালা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মহারাজ ভাঙ্গর ফা তাঁর সতের জন পুত্রের মধ্যে সমস্ত রাজ্য ভাগ কোরে দিয়েছিলেন; আগের ফা-র ভাগে পড়ে এই অংশ। সেই থেকেই ঐ স্থানের নাম আগরতলা। "আগের ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল।"

অতীতে যখন ত্রিপুরার রাজৈশ্বর্য সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে স্মরণীয় ছিল, তখন থেকেই অন্য এক ঐশ্বর্যে ত্রিপুরা সমৃদ্ধ—তা হলো এখানকার শিল্প। শিল্পের বিভিন্ন দিক, সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন ও কারুশিল্প—এ রাজ্যের প্রধান আকর্ষণ। এবং বাংলাদেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ কত নিবিড়, তার প্রমাণ মেলে এখানকার নানারকম হাতের কাজ থেকে। কথিত আছে, বাংলার বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট ত্রিপুরায় গিয়ে সম্মান লাভ কোরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের প্রেক্ষিতও রচিত হোয়েছে

ত্রিপুরার উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির দিয়ে। আগে অনেকবার এখানে এসেছি। তারপর পৃথিবীর ওপর যখন নানা বিপর্যয়ের ছায়া পড়লো, তখন আবার এলাম। অতীতের শিল্পবোধ, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতির সঙ্গে রিয়াংদের মধ্যে মোষ বলি দেবার প্রথাও এখন আছে। কিন্তু এদের মূল কেন্দ্রচ্যুত না হোলেও আবরণ গেছে পাল্টে।

ত্রিপুরার এখনকার কথা ভাবলেও অবাক লাগে। ত্রিপুরার জীবনের সেই ছন্দ আজও স্বচ্ছন্দগতি। সেই ছন্দের ঢেউ এসে মিশেছে এখানকার সাধারণ মানুষের কর্মজীবনে।

ত্রিপুরায় নিরলস কর্মব্যস্ততার চিহ্ন আগরতলা এবং অন্যান্য সমস্ত অংশে ছড়িয়ে আছে। ত্রিপুরার লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশভাগের পর প্রায় তিন লক্ষাধিক উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন। এদের কিভাবে কাজে লাগানো যায়, জীবনে আবার এদের কিভাবে নতুন সুর আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রণী হোয়েছে ত্রিপুরার পুনর্বাসন বিভাগ। আর এই বিভাগের পরিচালনার ভার যাঁর ওপর, তাঁর সঙ্গে একটুক্ষণ আলাপ কোরলেই বোঝা যায় বাস্তুচ্যুত এই নতুন অতিথিদের প্রতি তাঁর সমবেদনা কত গভীর। শুধু এইটুকুই নয়; তিনি বিশ্বাস করেন এই সব নতুন অধিবাসীগণ আবার নতুন কোরে জীবনের ভাষা খুঁজে পাবে—যদি এদের উপযুক্তরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ভদ্রলোকের নাম শ্রীকৈলাসবিহারী মাথুর। তাঁর এবং ঐ বিভাগেরই অধিকর্তা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের পরিচালনায় আগরতলার ১৪ মাইল দূরে আমতলী এবং ৩৫ মাইল দূরবর্তী মুড়াবাড়ীতে দু-টি হস্তশিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে।

শিল্পানুরাগী হিসেবে ত্রিপুরার রাজপরিবারের খ্যাতি বহুদিনের। এখনও হাতের কাজের জন্য লালুকর্তা (শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্মা) এবং বাঁশের কাজে উৎসাহিত করার জন্য রাজকুমারী কমলপ্রভার নাম উল্লেখযোগ্য। একদা এই রাজপরিবারের আগেকার শিল্পপ্রীতির স্বাক্ষর পাওয়া যেত। পূর্বে এই পরিবারের নারী-পুরুষের পরিচ্ছদের সঙ্গে অতীত ভারতের অনেক মিল ছিল। অঙ্গস্তার কাঁচুলির সঙ্গে ত্রিপুরায় পূর্বে ব্যবহৃত 'রিহা'র সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও নক্‌শার বৈশিষ্ট্যে তা সম্পূর্ণ নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু

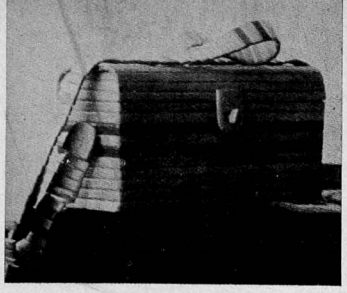

বাঁশের ফালি কেটে তৈরী একটি লেডিজ হাতব্যাগ।

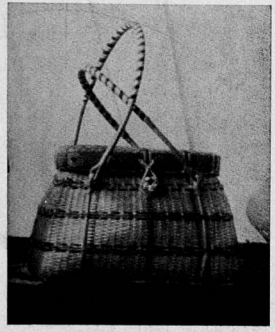

বাঁশের সূক্ষ্ম অংশে তৈরী আর একটি মেয়েদের হাতব্যাগ।

বাঁশের সূক্ষ্ম অংশে তৈরী আর-একটি হাতব্যাগের নমুনা-চিত্র।

বাঁশের সূক্ষ্ম অংশে তৈরী মেয়েদের বটুয়ার একটি মনোরম নিদর্শন।

দরবারী মোগল কারুকার্যের ছাপও যে এইসব পোষাকে পাওয়া যায় না—তা নয়। ত্রিপুরায় তৈরী রাজপরিবারের জন্যে বেনারসী জরির কাজও দেখা গেছে। কথিত, বহু বিখ্যাত ঢাকাই শিল্পীরা গিয়ে এই কাজের সূত্রপাত করেন।

পূর্বের এই শিল্প-ঐতিহ্য নতুনভাবে প্রকাশিত হোয়েছে সরকারী পরিচালনায় গঠিত হস্ত-চালিত শিল্পকেন্দ্রগুলির কাজের মধ্য দিয়ে। এদের কাজে যে শুধু অভিনবত্বই আছে তা নয়—সেই সঙ্গে যুক্ত হোয়েছে সুন্দর রুচি। কাজের নৈপুণ্যের সঙ্গে এসে মিলেছে শিল্পমন।

ত্রিপুরার আর একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান হলো আদিবাসীদের জন্য চারু ও কারুশিল্পের বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র। এ কাজের সুরু হয় শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্মার সুপরিচালনায়। শ্রীযুক্ত দেববর্মা বর্তমানে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ। এখানকার ছাত্রদের কাজের মধ্যেও যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখা যায়।

অনেকে হয়তো অবাক হবেন এখানকার বাঁশ ও বেতের কাজ দেখে। এগুলিকে শুধুমাত্র সুন্দর বোললেই যেন যথেষ্ট হয় না। মনে হয় সামান্য বিশেষণের প্রয়োগে এই অপূর্ব কারুকর্মকে গণ্ডিবদ্ধ করা হলো। চামড়ার অনেক ভালো কাজ আমাদের অবশ্যই চোখে পড়েছে। এখানকার

রবীন্দ্রনাথের লেখায় উল্লিখিত ত্রিপুরার বিখ্যাত কালীমন্দির।

চামড়ার কাজও বেশ প্রশংসনীয়। কাজগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের ধাঁচও কিছু কিছু চোখে পড়ে।

বাঁশ, বেত, চামড়া প্রভৃতির কাজ এখানে হোচ্ছে শিল্প-অধিকারের অধীনে। এই সব কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ও এই রকম সুরুচিবোধের জন্য শিল্প-অধিকর্তা শ্রীমৃণাল মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

ত্রিপুরার এই শিল্প-আবহাওয়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বিভাগে অনেক কাজ কোরিয়েছেন। কাজগুলির অধিকাংশই কোরেছেন শিল্পী শক্তি হালদার। চট্টোপাধ্যায়-দম্পতি ত্রিপুরায় চারু-কলার ব্যাপারে একান্ত উৎসাহী।

ত্রিপুরায় গিয়ে আরও অনেকের সাক্ষাৎ পেলাম। সরকারের উপদেষ্টা শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, আদিবাসী দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, পুলিশের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল জেলের অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল কর ভৌমিক প্রমুখ। শচীনবাবুর বাড়িতে আবার সাহিত্য-বাসরের বৈঠক বসে। জীবনে গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যে শিল্পচেতনার কোনও অসেতু-সম্ভব দূরত্ব নেই তার সাক্ষ্য দেবেন তিনি। বরঞ্চ তাঁর জীবনধারায় শিল্পবোধ পরিপূরক। জেলের তদারক করেন ননীবাবু। শক্তিশালী পুরুষ। কিন্তু দেখতে পাবেন তাঁকে সেই সঙ্গে নিপুণ হাতে বাগানের পরিচর্যা কোরতে। আবার তাঁরই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে কয়েদীরা সুন্দর সব হাতের কাজ কোরেছেন।

আগরতলায় আরও একটি প্রতিষ্ঠান বেশ প্রশংসনীয় উদ্যমে কাজ কোরে চলেছে, অরুন্ধতীনগরের 'মহিলা-সঙ্ঘ'। এখানকার সভ্যারা নানারকম হাতের কাজ করেন। যেমন তাঁতের কাজ, পাপোষ তৈরি, শ্যাম্পু

অরুন্ধতীনগরের মহিলাসঙ্ঘের কয়েকটি শিল্পকর্ম। শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতায় এই সঙ্ঘ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসরমান। দক্ষিণে উপবিষ্ট সঙ্ঘের দু'জন উৎসাহী কর্মী।

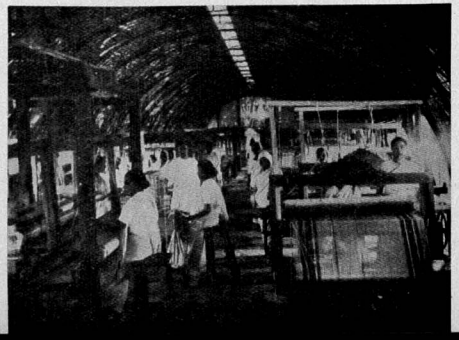

ত্রিপুরার পুনর্বাসন-বিভাগ পরিচালিত অভয়নগর 'হোম'-এ কর্মরত উদ্বাস্তু মহিলাবৃন্দ। নতুন জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেবার প্রচেষ্টার জন্য এঁরা সকলের-ই প্রশংসা অর্জন কোরেছেন।

ও সাবান প্রস্তুত। এই জিনিষগুলি বিক্রী কোরে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাতে কয়েকটি পরিবারের ভরণপোষণ করা হয়। কাজের সঙ্গে সঙ্ঘের সভ্যাদের কিছু কিছু লেখাপড়াও শেখানো হোচ্ছে। এর পরিচালনা কোরছেন শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীননীগোপাল কর ভৌমিকের নির্দেশানুযায়ী অতি সাধারণ বাঁশ ও বাঁশপাতার সাহায্যে তৈরী ত্রিপুরার আদিবাসীদের বাসস্থানের একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-নমুনা।

ত্রিপুরার শিল্প-উৎসাহী রাজপরিবার—লালুকর্তা, তাঁর স্বনামধন্য জামাতা শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র।

ত্রিপুরার শিক্ষা, সমবায় ও প্রচার-দপ্তরের সচিব কুমার রমেন্দ্রকিশোর (দক্ষিণে উপবিষ্ট)।

ত্রিপুরায় এর আগেও আমি এসেছি। তখন এখানকার শিল্পরসিক ব্যক্তিদের দেখে উৎসাহিত বোধ কোরেছি। কিন্তু এবার দেখলাম একটি নতুন ধারায় এই শিল্প-ঐতিহ্যের প্রয়োগ ঘটেছে। দিনানুদৈনিক জীবনে এখন দেখি শিল্পের স্থান। কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোয়েছে শিল্পবোধ। এটা আশার কথা।

বস্তুত, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলার অন্তর্গত ত্রিপুরা সাহিত্য ও শিল্পোৎসাহী স্বাধীন রাজ্য ছিল। শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে ত্রিপুরার রাজপরিবারের উৎসাহ ও অকৃপণ সাহায্য ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ত্রিপুরা মহাবিদ্যালয়ের প্রত্নাগারে সযত্নে রক্ষিত স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত বাংলার লোকশিল্পের নমুনা হিসাবে কাঁথা, কালীঘাটের পট ইত্যাদি দেখলে মনে হয় বাংলার কৃষ্টিজগতের সঙ্গে ত্রিপুরা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। সরকারের পরিচালনায় শিল্প ও সাহিত্য ব্যাপারে ত্রিপুরাবাসীদের উদ্যম বিন্দুমাত্র কমেছে বোলে মনে হয় না। বরঞ্চ পথঘাট থেকে সুরু কোরে শিল্প সাহিত্য নৃত্য গীত ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে এঁরা ক্রমশ আরও উন্নতি ও অগ্রগতির পথে চলেছেন।

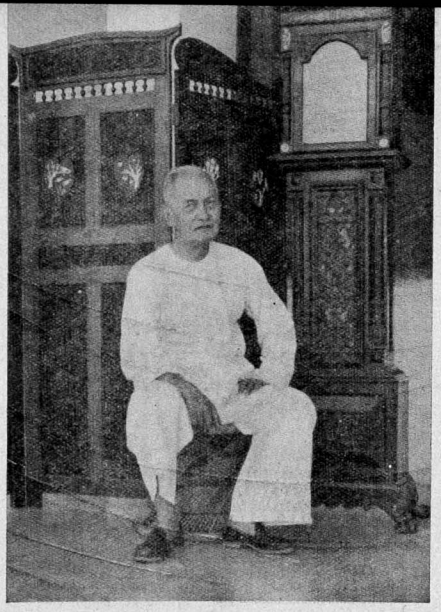

লালুকর্তা বোলে পরিচিত ত্রিপুরার বিখ্যাত কুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ। পশ্চাতে তাঁরই হাতে তৈরী একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি ও হাতীর দাঁতের কাজ-করা এক বিরাট কাঠের স্ক্রীণ।

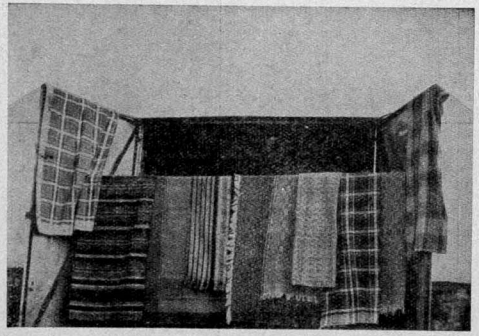

ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ পরিচালিত শিল্প-কেন্দ্রে তৈরী বয়নশিল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পূর্বাঞ্চলের তিনটি আদিবাসী মেয়ে।

পূর্ব ভারতীয় আদিবাসীদের শিল্প

গোপীনাথ সেন

শিল্পের লীলাভূমি সুপ্রাচীন এই ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সহজাত শিল্পবোধ এবং শিল্প-নির্মিৎসা প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষ্য করার মতো। ভারতের আদিম অধিবাসীদের বেলাতেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর্যরা এদেশ অধিকার করার পর বিপর্যস্ত আদিবাসীরা পাহাড়-পর্বত, বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ কোরে নিজেদের প্রাণরক্ষা কোরেছিল। সেখানে তারা স্বীয় সংস্কৃতি সযত্নে নৃত্য, গীত, শিল্প ও চিত্রকলার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তার নমুনা কেউ আদিবাসীদের গ্রামে বেড়াতে গেলে জানতে পারবেন। আদিবাসীদের অফুরন্ত আনন্দ উৎসবের প্রকাশ নৃত্য ও গীতের মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি চিত্রকলায় রূপায়িত তাদের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। সভ্যজগতের চিত্রকলা কেবলমাত্র চিত্রকলার জন্যে, কিন্তু জগতের আদিম মানুষ শিল্প ও চিত্রকে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার মধ্যে প্রকাশিত কোরেছে। মনের

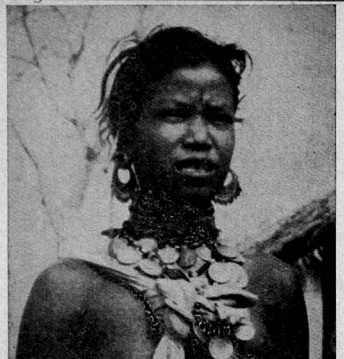

। বহু বিচিত্র মুদ্রালঙ্কারে ভূষিতা ত্রিপুরার রিয়াং রমণী।

ভাববস্তুকে সভ্যতার ভাবজগতের মাঝে আবদ্ধ না রেখে তার অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছে নিত্য আবশ্যকতার মাঝখানে। আদিবাসীদের দেহ থেকে জীবনের প্রতিটি দিকে নজর দিলে মনে হয় সবই যেন চিত্রকলার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। জীবন্ত চিত্র যেন আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা কোরছে। আদিম সভ্যতার চিত্র যেন সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে ধরা পড়েছে ছন্দে, গীতে, নৃত্যে ও শিল্পে। আদিবাসীদের কাশশুভ্র চরিত্রমাধুর্য, তাদের কামনা-বাসনার অকৃত্রিমতা, তাদের চিত্রাবলীর রঙে-রেখায় স্পন্দিত। আদিম শিল্প ও চিত্রকলার পরিচয় কেবল দর্শনশালায় আবদ্ধ নয়, তার প্রকাশ সমগ্র বিশ্ব-চিত্রশালার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তার অনুশীলন কোরতে হোলে পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ কোরতে হবে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিছু কিছু আদিম শিল্প ও চিত্রকলার নমুনা তাঁদের আবিষ্কারের মধ্যে প্রকাশ কোরেছেন। মাদ্রাজের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে পাথরের ওপর অঙ্কিত চিত্রসমূহ সেই আদিযুগের মানুষদের কৃষ্টির উল্লেখ্য নিদর্শন। তারপর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর্চিবল্ড কার্লাইল ও জে, ককবার্ণ মির্জাপুরের কাছে শিলাঙ্কিত ছবি আবিষ্কার কোরেছিলেন। ভারতের কত যুগ অতিবাহিত হোয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ তাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনকে ভুলতে পারেনি। সিন্ধু-সভ্যতার বিরাট পর্ব মহেন্‌জোদারো এবং হরপ্পায় পাথর ও ধাতব দ্রব্যের ওপর নানান কাজ দেখলে বিস্মিত হোতে হয়। ইতিহাসের পণ্ডিতদের মতে মানুষের আঁকবার প্রচেষ্টা ও উন্মেষ, এ-দুয়ের নিদর্শন বড় বড় পাহাড়, গাছ, শিলা, ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষগুলিতে বিধৃত।

ভারতীয় লোকশিল্প ও চিত্রকলাগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কোরতে গেলে দেখা যায় তার আনুষ্ঠানিক দিকটা বিরাট ক্ষেত্র অধিকার কোরে আছে এবং এটিকে বেশ ভালোভাবে বুঝতে হোলে কার্যকারিতা সংক্রান্ত ও সামাজিক অর্থগুলিকে এক একটি কোরে বুঝতে হবে। আদিবাসীদের কোন শিল্প ও চিত্রকলা কেবল উপভোগের জন্যে নয় তাতে তাদের জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগ আছে। তাদের গ্রামগুলি যেন শিল্পকলার সমৃদ্ধ আগারস্বরূপ। আদিবাসীদের বেশিরভাগ শিল্প ও চিত্রকলা সৃষ্টিক্ষম ও ধর্মীয় বা ঐন্দ্রজালিক আবেষ্টনে বেষ্টিত। তাদের সে সকল শিল্প ও চিত্রকলা বিচার কোরলে দেখা যাবে তাদের চোখের মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টির অনুভূতি বর্তমান।

আদিবাসীদের ধর্মের অঙ্গগুলি বা যাদুবিদ্যার দিকে নজর দিলে দেখতে পাব তা সৃষ্টিশীলতার দিকে প্রবাহিত হোয়েছে। আদিম চিত্রকলা নিখাদ, যেন পাকা সোনা, কারণ এর অনুপ্রেরণা তাদের আদিমতম পরম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। এর মধ্যে কলাকৌশলের চাতুরি বা কারুকার্যের আড়ম্বর নেই, যাতে সে ছদ্মবেশে কাউকে ভোলাতে পারে। ভারতের উঁচু ধরনের সকল শিল্পকলায় দেবদেবীর মূর্তি বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যায়। আদিবাসীদের সে-রকম সনাতন হিন্দুদের মতো পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতিমা দেখতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাথর, কাঠ আর মাটি দিয়ে তাদের নিজস্ব মূর্তির ভেতরও যেন শিল্পকুশলতা লুকিয়ে আছে।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিম জাতিদের মূর্তির মধ্যে গণ্ড, সাঁওতাল, ভীল আর নাগাদের এ-রকম বহুসংখ্যক পরিচয় পাওয়া যায় তা যেন তাদের নিজেদের কল্পনার সৃষ্টি। রাঁচি জেলায় লোহারডাঙায় ওঁরাওদের দেবদেবী দেখতে গিয়ে দেখলাম একটি মাঠের মাঝখানে মাটির ঘরে যুবতী নারীর দুটি বক্ষের মতো পাশাপাশি দুটি পাথর; এই দেখে মোড়লকে তাৎপর্য জিজ্ঞাসা কোরতে সে বোলল 'এটি হচ্ছে

মহাদেবীর মূর্তি।' দেখে একটু অবাক হোতে হয়; একেবারে সৃষ্টির মূল কল্পনার প্রতীক কেমন কোরে তারা জানল! এ-দুটি পাথরের বক্ষের মধ্যে বিরাট দেবী-কল্পনা রয়েছে—তিনি যেন সমগ্র ওঁরাওজাতিকে তাঁর মাতৃদুগ্ধে পালিত কোরছেন। আর এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম একটি অশ্বত্থগাছের গুঁড়িতে সিঁদুর মাখানো, তিনি তাদের গ্রামদেবতা; ধানক্ষেতে একটি ছোট্ট গর্ত, চারদিকে মাটি দিয়ে ঘেরা; এটা হচ্ছে শস্যদেবতা, ইত্যাদি। সাঁওতালদের মারাংবুরু অধিষ্ঠান শাল গাছে আর মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া আদিবাসিগণ পিতলের ঘোড়া, হাতী এবং মনুষ্য মূর্তিগুলি তাদের উপাস্য দেবতা। আদিম ধর্মের মধ্যে শিল্পের প্রকাশভঙ্গিমা যেন আধফোটা ফুলের মতো ফোটবার আকাঙ্ক্ষায় স্থির হোয়ে আছে।

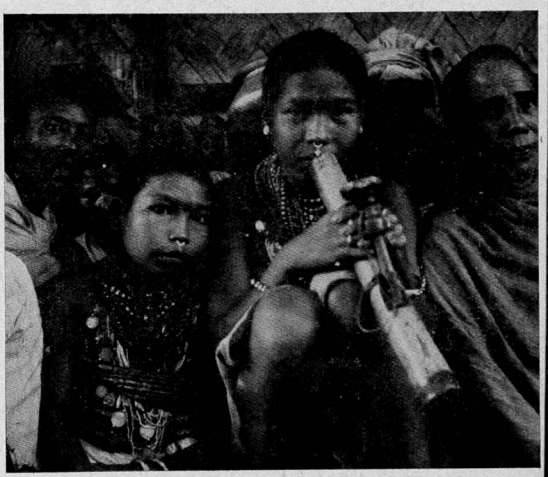

আদিবাসীদের বিবাহে, শিল্প-কলা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। বিয়েতে আদিবাসীরা অপদেবতা বা শত্রুদের বিনষ্ট কোরবার জন্যে বিবাহমণ্ডপকে নানা চিত্রবিচিত্র কোরে সাজায়। মান্দালায় গণ্ডরা বিবাহবাসরের মাঝখানে নানারকম কারুকার্য-করা দীপদানি রাখে। এই দীপদানিটি আদিম কর্মকার আগেরিয়ারা তৈরী কোরে-ছিল। দীপের দানিটির ওপরটা লোহার তৈরী এবং তাতে খুব সুন্দরভাবে হরিণ, মানুষের মাথা ও হাত কোঁদানো। দার্জিলিংএর ভুটিয়া আদিবাসিগণের তৈরী সাপের কারুকার্য-করা কাঠের দীপদানিটি বেশ নিখুঁত শিল্পের পরিচয় দেয়। এ ছাড়া সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, গণ্ড এবং মুরিয়াদের বিয়ের জন্য মেয়েদের রাংএর গয়নার চমৎকার সূক্ষ্মকাজ দেখলে তাদের প্রাচীন কৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিয়েতে নানা আদিবাসীদের কাঠের কাজের মধ্যে সাঁওতালদের বিয়ের পাল্‌কিটিকে প্রধান স্থান দেওয়া যেতে পারে। পাল্‌কিটির দিকে সাঁওতালজাতির নজর থাকে। এর ওপর তাদের বনিয়াদি নির্ভর করে। পাল্‌কিটি কাঠের তৈরী। সাঁওতাল ছুতোর মিস্ত্রি বাটালি বা দাও দিয়ে বেশ ধীরে ধীরে নিপুণতার সঙ্গে কুঁদিয়ে নানারকমের বিয়ের ঘটনাগুলি আঁকে। অন্যান্য আদিবাসীদের কাঠশিল্পগুলি চেরাই কোরে প্রস্তুত করা হয়। কাঠের শিল্পগুলির চিত্র নানারকমের। কাঠের ওপর খোদিত মূর্তির উদ্গতিগুলি পরীক্ষা কোরলে দেখা যায় তাতে নারীদের সঙ্গে পুরুষদের সাক্ষাৎ, গাভী ও বৎস, বন্ধুতে বন্ধুতে আলিঙ্গন ও মাতা সন্তানকে স্তন

জলভরা একটি বাঁশের হুকায় ধূমপানরতা ত্রিপুরার জনৈকা আদিবাসী মেয়ে।

খাওয়াচ্ছে ইত্যাদি, অর্থাৎ যাতে বিবাহের সকল উৎসবকে ও মানুষের জীবনের প্রতিটি আলেখ্যকে সুস্পষ্ট কোরে দেখানোই এই শিল্পের উদ্দেশ্য।

আদিবাসীদের শিল্পকলার একটি বিরাট ঐতিহ্য মৃতদেহের সংস্কারকে বেষ্টন কোরে গড়ে উঠেছে। গঞ্জামের আদিবাসী জেলেরা তাদের মৃতদেহের প্রতিরূপ মূর্তি তৈরী কোরে সমুদ্রতীরে ছোট ছোট সমাধিমন্দির গড়ে তোলে এবং

। বিভিন্ন বাদ্যবাদনরত পূর্বাঞ্চলের কয়েকজন আদিবাসী।

তার মধ্যে এই মূর্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠা কোরে থাকে। কিছুদিন পরে এই মূর্তিগুলিকে খুব অসহায় ও ভূতের মতো দেখায়। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের তৈরী মূর্তিগুলি বেশ রঙচঙে হয়েছে এবং তারা এগুলিকে নানারূপ ভঙ্গিমায় তৈরী কোরছে, এমনকি সৈনিকের মতো রূপদান কোরে থাকে। মধ্য-প্রদেশের বাস্তার জেলার মুরিয়ারা তাদের মৃতদেহের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কাঠের স্তম্ভ তৈরী করে। এই কাঠের স্তম্ভে নানাকিছু আঁকা থাকে, যেমন, নৃত্যবিদের দল, স্ত্রীলোকেরা একটি পাত্র থেকে অভ্যাগতকে মদ দিচ্ছে ও কেউ পূজা কোরছে। আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ফোম ও কোনয়াক আদিবাসীগণ গোরস্থানে কাঠের প্রতিমূর্তি তৈরী করে। তাদের ধারণা এ সকল মূর্তিগুলির মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা আরাম করবার জন্যে আসে। এই কাঠের মূর্তিগুলি খুব সুন্দর রঙচঙ কোরে তার ওপরে উল্‌কির ফোঁটা দিয়ে আঁকে এবং নানারকমের গয়না পরিয়ে একটি তরোয়াল কোমরে ঝুলিয়ে দেয়। সাঁওতালরা মৃতব্যক্তিকে গোর কিংবা দাহ কোরলে তার সঙ্গে একটি কারুকার্য-করা কাঠের টুকরা, বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র দেয়।

এবার চিত্রকলায় আদিবাসিদের দান সম্বন্ধে আলোচনা কোরতে গেলে দেখা যায় বিশ্বাস ও লোকাচারের সঙ্গে এর বিশেষ যোগাযোগ আছে। ভারতে আদিবাসীদের মধ্যে উড়িষ্যার কোরাপুত এবং গঞ্জামের স্যাওড়া আদিবাসীদের

বাড়ীগুলি নানারকমের ছবি আঁকা। এই চিত্রগুলির উদ্দেশ্য হোল দেবতা, উপদেবতা এবং পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করা, যাতে না তারা কেউই অসন্তুষ্ট হোয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে অমঙ্গল বা উৎপাত করে। এমনকি মৃতদের সম্মানার্থে, রোগ তাড়াবার জন্যে, জমির উৎকর্ষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে এবং বড় বড় উৎসবে দেওয়ালে ছবি আঁকা হয়। এসকল ছবি আঁকবার জন্যে তাদের নির্দিষ্ট চিত্রকর থাকে। যারা এ ছবি আঁকে তারা স্বপ্ন থেকে অনুপ্রেরণা পায়। ছবি আঁকবার আগের দিন সে নির্দিষ্ট দেওয়ালের সামনে ঘুমোয় এবং ঘুমোবার পর স্বপ্ন দেখে উঠেই কল্পনায় আগত ছবিটি বাস্তব রূপ তার তুলিকায় দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলে। এ ছবিটিতে সাদা ও লাল রঙ দেয়। তারপরে এটির উদ্দেশ্য বাড়ীর সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে থাকে। এই ছবিটির মধ্যে সে দেখায় মানুষ স্বর্গে গেলে দেখতে পায় ভগবান তাঁর প্রিয় বাঘকে আদর কোরছে এবং নরকে যারা যায় সজারু সেখানে পাহারা দিচ্ছে। আজকাল শিক্ষার প্রভাবে তারা নিজেদের চিন্তাধারার পরিবর্তন কোরেছে বটে কিন্তু ছবি আঁকা ঠিকই বজায় আছে। সেখানে চিত্রকরেরা ভগবানের বাহন এরোপ্লেন, ট্রেন ও মোটর গাড়ী এঁকে দিয়েছে। তারা মৃতব্যক্তিদের যে ছবি আঁকে তা কাউকে দেখায় না; ওটিকে হাঁড়ি বা বাক্সে লুকিয়ে রাখে। এরকম চিত্রকর সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়। যখন কোন লোক মারা যায় তখন সে চিত্রকর তার বাড়ীতে এসে মৃতের সম্বন্ধে নানারকম গল্প বলে। তারপরে সে জানায়

নৃত্যরতা পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী মেয়েরা।

যে মৃতব্যক্তি পরলোকে শীতে ও খাদ্যাভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছে তবে তা তাকে দিলে সে তাকে পৌঁছে দেবে। তখন গৃহকর্তা অন্য কোনবিধ উপায় না দেখে তার সাধ্যমতো জিনিষ দেয়। চিত্রকর আগে একটি ছবি এঁকে আনে ও যখন সেই জিনিষগুলি পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে বলে, সযত্নে যেন এটি গুপ্ত স্থানে রাখে তা না হোলে আবার সে এসে বাড়ীতে উপদ্রব কোরতে পারে। সীমান্ত প্রদেশের বহু উপজাতি যথা চ্যাং, কোনয়েক, ফোক, সাংতাং এবং নরমুণ্ডশিকারী নাগাগণ মৃতের সম্মানার্থে বিরাট একটি কাঠে নানারূপ চিত্র খোদাই কোরে তাতে মানুষের মাথা আটকে দেয়।

ভারতের আদিবাসীদের শিল্প ও চিত্রকলার কৈশোর অবস্থা দেখতে হোলে পাহাড়িয়াদের কাছে গেলে বুঝতে পারা যাবে, তার অতীত ঐতিহ্য কিরূপ ছিল। পর্বতমালার নানা স্থানের আদিবাসীদের শিল্প ও চিত্রকলার পরিচয় পূর্বভারতে বর্তমান। তার মধ্যে ত্রিপুরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার কোরে আছে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের সম্বন্ধে মেজর ফিসার তাঁর 'মেময়ার অফ্ শিলেট্' নামে গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন—ত্রিপুরার লোকেরা কাছারিজাতি থেকে উদ্ভূত হোয়েছে, কারণ তাদের ধর্ম, আচারব্যবহার এবং চেহারা দেখলে তা বোঝা যায়। প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরা ও কাছার এই দুই দেশের রাজাদের ভেতর বিশেষ আদানপ্রদান ছিল। রেভারেণ্ড জে লং তাঁর 'রাজমালা' গ্রন্থে এর আলোচনা কোরেছেন।

। ত্রিপুরার কয়েকটি আদিবাসী মেয়ে।

ত্রিপুরাতে চারটি আদিবাসী বাস করে, যথা রাজবংশী, নওয়াতিয়া, জোমালিয়া এবং রিয়াং। এদের ভেতর রাজবংশীদের স্থান অনেক উর্চুতে, কারণ তাদের উচ্চজাতি হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারা মনে করে শিব হচ্ছে তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং এজন্য তারা নিজেদের শৈব বোলে থাকে। আর অন্য তিনটি জাতি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখনও চারটি উপজাতি তাদের উপাস্য দেবতা বাঁশগাছকে পূজা কোরে আসছে, যেমন বাংলায় কোলেরা শালগাছকে পূজা করে। তাদের শিল্প ও চিত্রকলার মূল হচ্ছে বাঁশগাছ। বাঁশ থেকে খাবার পাত্র, আসবাব ও নানারকম শৌখিন জিনিষপত্র তৈরী কোরে তার ওপরে কুঁদে কুঁদে নানারকম লতাপাতা মানুষ জন্তু প্রভৃতি ছবি এঁকে এগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কোরে তোলে। এমন সুন্দর ও সূক্ষ্ম শিল্পকলা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এছাড়া তাদের বয়নশিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছে। কাপড়ের ওপর বহু রকমারি রঙের ও বাহারি কাজ দেখা যায়। ত্রিপুরার আদিবাসীদের ওপর তথ্যপূর্ণ কোনরকম লেখা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র তাদের সম্বন্ধে রিজলে ও ড্যাল্টন তাঁদের জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে সামান্য পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্য ও গীতশিল্পের মধ্যে দিয়ে বহুযুগ ধরে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আছে। এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বহু চিন্তাধারার আদানপ্রদান দেখা যায়। যেমন, রিয়াংদের লোককথার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তার কোরেছে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের লোকশিল্প ও চিত্রকলার প্রমাণ বর্তমানে লোকপ্রিয় বাঁশশিল্পে দেখা যায়।

আদিবাসীদের বস্ত্রশিল্পও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের বস্ত্রের ওপর নানা রঙের চিত্র-রূপ দেখলে মুগ্ধ হোতে হয়। পূর্বাঞ্চলের নাগা, লাখেয়ার, আবোর, সাঁওতাল, ভূটিয়া, লেপচা, খাসি, গণ্ড, মুরিয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের কারুশিল্প আমাদের কারুশিল্পের চাইতে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। তবে এখন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাদের কৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হোয়ে যাচ্ছে। তার ওপর নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজকর্মিগণের হস্তক্ষেপে এবং অনুৎসাহিতার জন্যে তাদের শিল্পও নষ্ট হোতে চলেছে। তাকে বাঁচাতে হোলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে, আন্তরিক সাহায্য কোরতে হবে।

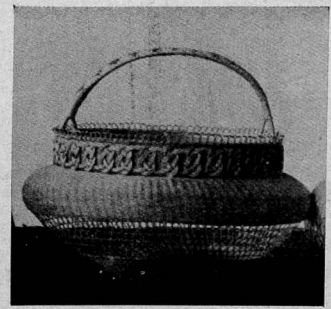

। ত্রিপুরার একটি সূক্ষ্মতম বাঁশের কাজ।

'শকুন্তলা'র ইলাষ্ট্রেশন।

প্রচারশিল্পী মাখনলাল দত্তগুপ্ত

'শকুন্তলা'র ইলাষ্ট্রেশন।

'শকুন্তলা'র ইলাষ্ট্রেশন।

'শকুন্তলা'র ইলাষ্ট্রেশন।

রঘুনাথ গোস্বামী

আজকের দিনে বিজ্ঞাপন একটা শিল্পকর্মের পর্যায়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন আজকের আকার ধারণ করবার আগের যুগের কথা বলা যাক।

খবরের কাগজ আর সাময়িকপত্র-পত্রিকা খুলে খোস-পাঁচড়ার মলম, মনোমোহিনী আজব সুন্দরী কেশতৈলের কুদৃশ্য বিজ্ঞাপন আর না হয় বিলিতি নকল-করা অসংখ্য বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মানুষের চোখ যখন ক্লান্ত হোয়ে পড়লো সেই সময় হঠাৎ দেখা গেল কে যেন একজন শিল্পী এক ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্র আঁকতে সুরু কোরেছে যা অসংখ্য কুদৃশ্য বিজ্ঞাপনের মাঝখানে বেখাপ্পা রকমের সুন্দর। ছবিগুলি জাতে বিজ্ঞাপন তবুও যেন দেখলে চোখ জুড়োয়। শিল্পীর নাম মাখন দত্তগুপ্ত। কারখানার যে বাঁশীতে চিরকাল ভোঁ বেজে এসেছে হঠাৎ যদি কোন দিন সকাল বেলা শোনা যায় সেই বাঁশী থেকে মঙ্গল-ভাঁয়রো বা জৌনপুরীর মিঠে তান বেরুচ্ছে তা হোলে লোকে চমকে উঠবে। বিজ্ঞাপনে মাখনবাবুর কাজ এমনি ধারাই বিস্মিত কোরেছিল সকলকে। শিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত ১৯৪৬ সাল থেকে বিজ্ঞাপনের কাজে ছবির মেজাজ এনে এক বিস্ময়কর সুন্দর ধারার সূত্রপাত করলেন।

প্রায় আট বছর আগে আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রি পত্রিকার তরফ থেকে জনৈক সাংবাদিক মাখনবাবুর সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য তাঁর কাছে যান সাক্ষাৎকার কোরতে। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "He was himself approached for the further facts of his life and work. His answers were shy and vague"। মাখনবাবুর সম্বন্ধে লিখবার জন্য দীর্ঘ আট বছর পরে আমি তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎকার কোরতে যাই এবং আমিও আমার পূর্ববর্তী লেখক আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রির সেই সাংবাদিকটির উক্তিরই পুনরাবৃত্তি কোরতে চাই। কিন্তু সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এই প্রতিভাবান স্বল্পবাক শিল্পীটি যতই "shy and vague" হোন তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর কাজই তাঁর পরিচয়। কাজ ছাড়া তার জীবনের অন্যান্য পূর্ববৃত্তান্ত বাহ্য।

মাখন দত্তগুপ্ত-র
আঁকা টা-বোর্ডের ও অন্যান্য
কয়েকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের
জন্য করা বিজ্ঞাপনচিত্রের
বিভিন্ন নিদর্শন।

মাখন দত্তগুপ্ত ময়মনসিংহের লোক। প্রায় আট বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকা সুরু করেন এবং তারও আট বছর পরে তিনি কোলকাতার গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টে ভর্তি হন। আর্ট স্কুলের কমার্শিয়াল বিভাগের এই ছাত্রটি প্রত্যেক বছরই প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন এবং এ ছাড়া একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের বাৎসরিক প্রদর্শনীতেও নিয়মিত পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রির প্রদর্শনীতে তিনি এক সঙ্গে পোষ্টার, হেডিং, প্রেস লে-আউট, ক্যালেণ্ডার, শো-কার্ড এবং বুক ইলাষ্ট্রেশন এই সব কয়টি বিভাগে পুরস্কার পান।

অনেক পুরস্কার এবং অনেক সাফল্যের পরও স্কুল থেকে বেরিয়ে তাঁকে শিউড়ীতে স্কুল মাষ্টারীর কাজ নিতে হয়। কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি তাঁর স্কেচ খাতাটি বগলে করে কোলকাতায় চলে আসেন এবং কোলকাতা ডি, জে, কিমার কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন। ডি, জে, কিমারের সহকারী ম্যানেজার স্কেচ-খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে এই শিল্পীর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝতে পেরে তাঁকে কাজে নিযুক্ত করেন। ডি, জে, কিমারেই তাঁর কমার্শিয়াল আর্টিষ্টজীবনের সুরু। এই-খানেই তিনি বিখ্যাত শিল্পী অন্নদা মুন্সী এবং সত্যজিৎ রায়ের সাহচর্যে তাঁর বেশিরভাগ বিখ্যাত কাজগুলি করেন। মাখনবাবুর মতো শিল্পীর জাতিনির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট এবং ফাইন আর্টিষ্ট এই দুই জীবনের সমগ্র কাজ একত্র কোরে পাশাপাশি রেখে দেখলে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে মাখনবাবু আসলে জাত শিল্পী। কমার্শিয়াল আর্টের উদ্দেশ্য এবং ফাইন আর্টের উদ্দেশ্যের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। উদ্দেশ্যের এই

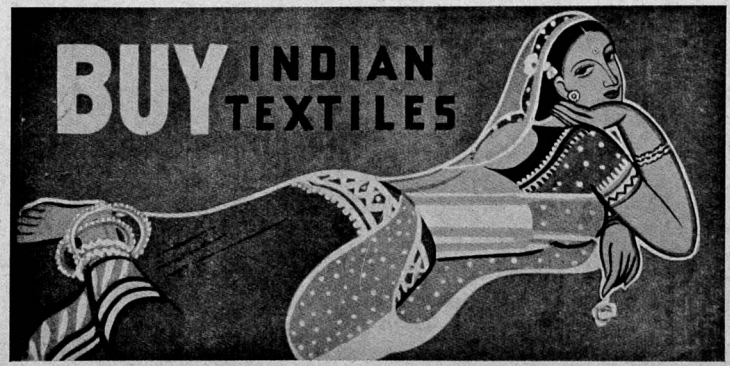

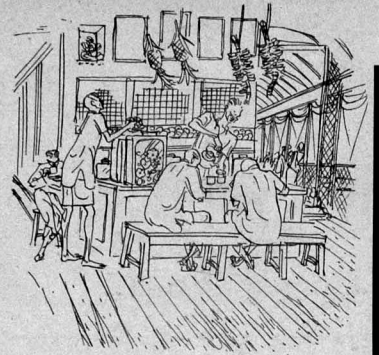

এই কয়েকটি রেখাচিত্র
টী-বোর্ডের প্রকাশিত একটি পুস্তিকার ইলাস্ট্রেশন।

টী-বোর্ডের এই রেখাচিত্রের শিল্পী ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সার্থকতায় মূর্ত কোরে তুলেছেন।

বিভিন্নতার ফলে শিল্পীর কাজের 'কোয়ালিটি'ও অনিবার্য-ভাবে বদলে যায়। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক একজন শিল্পীকে, যিনি হয়তো খুব ভালো 'পোর্ট্রেট পেণ্টার', তাঁকে যদি মনোমোহিনী কেশতৈলের বিজ্ঞাপন আঁকতে দেওয়া হয় তা হলে তিনি একজন উচুঁদরের পোর্ট্রেট পেণ্টার হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের খাতিরে তিনিও বিজ্ঞাপনজগতে বহু ব্যবহৃত সেই চিরাচরিত মনোমোহিনীর ছবিই এঁকে দেবেন এবং তাঁর আঁকা বিজ্ঞাপন-চিত্রটির মধ্যে তার পোর্ট্রেট পেণ্টারের প্রতিভার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য ছবির কোয়ালিটি

বদলে যাওয়া বোলতে এইটাই বোঝাতে চাইছি। অর্থাৎ যে পুজোর যে মন্ত্র। কমার্শিয়াল আর্টের একটা চিরাচরিত ফর্ম (কনটেণ্ট বোলে কমার্শিয়াল আর্টে কিছু আছে কি না সে সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করবেন) বা ছক্বা আছে এবং এই ছক্বার বাইরে যাবার উপায় নেই। মাখনবাবু কমার্শিয়াল আর্টের জগতে প্রবেশ কোরে ফাইন আর্ট এবং কমার্শিয়াল আর্টের মাঝখানের সীমারেখাটা মুছে দিলেন। উদ্দেশ্যের পার্থক্য তাঁকে শিল্পীধর্ম থেকে চ্যুত কোরতে পারল না।

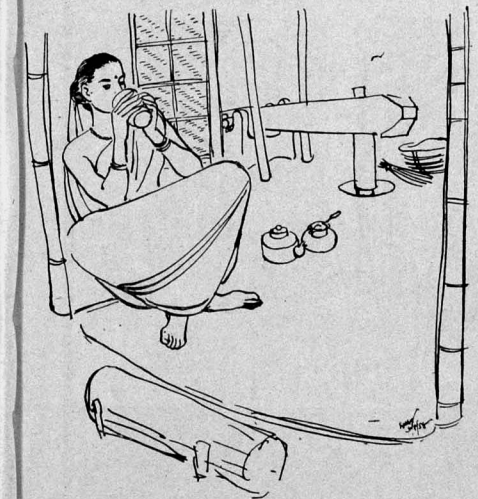

কমার্শিয়াল আর্টের জগতে মাখনবাবু ইলাস্ট্রেশনের কাজই বেশি করেছেন। তাঁর করা ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সমসাময়িক কোনো শিল্পীর কাজের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

তাঁর ইলাস্ট্রেশনে কলম বা তুলির লাইনগুলি আশ্চর্য রকমের দুঃসাহসিক। এটমোস্ফিয়ার সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর ইলাস্ট্রেশনে এমন একটা 'লোকাল কালার' পাওয়া যায় যা কমার্শিয়াল ইলাস্ট্রেশনে অভূতপূর্ব। সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি ফাইন আর্টের 'ইডিয়ম'গুলি আশ্চর্য দক্ষতা এবং সহজতার সঙ্গে ব্যবহার কোরে কমার্শিয়াল ইলাস্ট্রেশনে একটা ছবির মেজাজ এনে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভূতপূর্ব ইণ্ডিয়ান 'টি মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ডের' জন্য আঁকা বিজ্ঞাপনগুলি উল্লেখ-যোগ্য। এই সিরিজে তিনি বিভিন্ন ঋতুতে বাংলার গ্রামীণ জীবনের ছবি এঁকেছেন। এগুলি আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনচিত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হোয়ে থাকবে বোলে আমার বিশ্বাস। মাখনবাবুর করা বুক-ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে বোধ হয় 'শকুন্তলা' 'বেদে' 'যতনবিবি'-র নাম করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে 'শকুন্তলা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ছায়ায় বর্ধিতা শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদারা তাঁর ছবিতে অপূর্ব মাধুর্য-মণ্ডিতা হোয়ে ফুটে উঠেছে। মহাকবি কালিদাসের এই অমর কাব্যের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা আশ্চর্যরকমের শুচিশুভ্র। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনের রচনা 'বেদে'র সিগনেট সংস্করণে তিনি কিছু স্ক্রেপার বোর্ড ইলাস্ট্রেশন কোরেছেন। সেগুলির মধ্যে আঁট কোরে কাপড়-পরা ছাগলছানা

পাশের ছবিটি মাখনবাবুর আঁকা একটি তৈলচিত্র। মাঝের ছটি গোয়াশ রঙে আঁকা ছবি। সর্বনিম্নের এবং এর পরপৃষ্ঠার বড় ছবিটি তৈলচিত্র।

কোলে আদুরী গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, রুক্ষ চুল তার বাতাসে উড়ছে; কিংবা ছোট ছোট টেল-পিসের জন্যে আঁকা পারাপারহীন নদীর উত্তাল তরঙ্গের সাথে জোয়ান মাল্লা শক্ত হাতে দাঁড় ধোরে যুঝছে প্রভৃতি ইলাষ্ট্রেশান

মনে রাখবার মতো। ইলাষ্ট্রেশনে তাঁর স্টাইল অত্যন্ত বোল্ড ও ডাইরেক্ট। টান-টোনে তিনি অসম্ভবরকমের বেপরোয়া। তাই বোলে ডিটেল্‌স্‌-এর সম্বন্ধে তিনি আদৌ উদাসীন নন। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি এমন ডিটেল্‌স্‌-গুলি বেছে নিয়ে আঁকেন যেগুলি তাঁর পরিবেশ সৃষ্টির কাজে বিশেষ সহায়ক। তাঁর ইলাষ্ট্রেশনের মানুষজন ঘর-বাড়ী জন্তু-জানোয়ার কোন কিছুই 'ডামি' নয়, অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং একান্তভাবে ভারতীয়। তাঁর ছবির মানুষ-গুলি এত বেশি ভারতীয় যে অনেক সময় তাকে ম্যানারিজম বোলে মনে হয়। কমার্শিয়াল ইলাষ্ট্রেশনে মাখনবাবুর ম্যানারিজম আছে একথা স্বীকার কোরে নিলেও বোলব যে তাঁর সাফল্য তাঁর ম্যানারিজমেই বিধৃত। রঙিন

ইলাষ্ট্রেশনগুলিতেও রং-এর রকমারি সূক্ষ্ম টোনের সাহায্যে ডাইমেনসান আনার চেয়ে সোজাসুজি জোরালো রং লাগিয়ে বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে ড্রইং কোরে দেওয়ার দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি।

কমার্শিয়াল আর্ট এবং ফাইন আর্টের কাজ এই উভয় ক্ষেত্রেই মাখনবাবু প্রায় সব্যসাচী। বর্তমানে কমার্শিয়াল কাজ ছেড়ে দিয়ে মাখনবাবু চিত্রকর হিসাবে অভ্যুদয়ের পথে। ছবিতেও তিনি উজ্জ্বল বর্ণ প্রয়োগ কোরতে ভালোবাসেন কিন্তু সোম্বার শেডের দিকেই বোধ হয় তাঁর ঝোঁক বেশি। তাঁর ছবির বর্ণযোজনা দেগা এবং প্রকাশভঙ্গীতে দেশীভাব একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছবির মধ্যেও মাখনবাবু গোড়া থেকেই অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা কোরে আসছেন। গোড়ার দিকে গোয়াশ রঙে আঁকা 'মাদার এণ্ড চাইল্ড' 'বেগার উয়োম্যান' প্রভৃতি ছবি দেখলে বোঝা যায় মাখনবাবু একসময়ে জোরালো রং দিয়ে সোজা ঢঙে বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে লোকশিল্পের ধারার সঙ্গে নিজের কাজের একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা কোরেছেন।

ছবি আঁকার জগতে ইদানীং পরিষ্কার দুটি দল হোয়ে গিয়েছে। একদল আছেন যাঁরা একটা বিশেষ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে

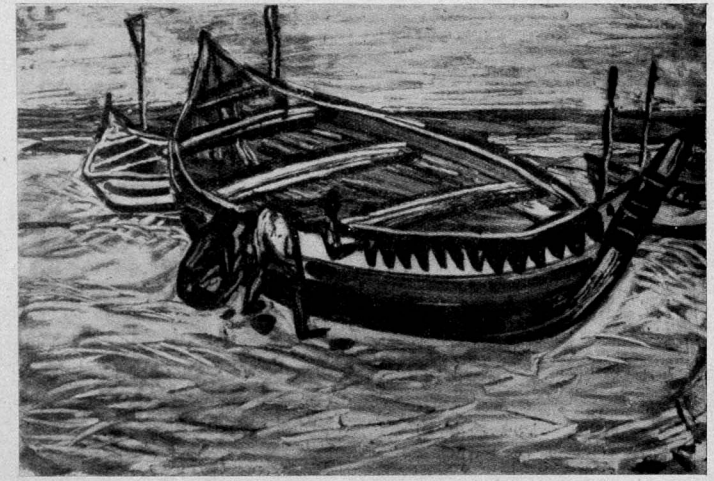

তেলরঙে আঁকা একটি নিসর্গচিত্র।

রেনোয়াকে খুব বেশি মনে কোরিয়ে দেয়। প্রথম দিকে তিনি তাঁর গৃহ গৃহিণী এবং আত্মজ আত্মজাদের অগণিত ছবি এঁকেছেন। শিউড়ী অঞ্চলে অনেকদিন ছিলেন বোলে ওখানকার সাঁওতাল জীবনের অনেক মুহূর্তকে তিনি ছবিতে ধোরে রেখেছেন। তাঁর স্যাড ষ্টাডির মধ্যে অনেকগুলিই সুন্দর। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতেই নয় মাখবাবুর ছবির পৌঁছে গিয়ে থেমে গিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা যে ফুরিয়ে গিয়েছেন একথা তাঁরা বুঝতে না পেরে একই জায়গায় বসে রোমন্থন এবং চর্বিত চর্বণ কোরে চলেছেন। অপর দল প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে নানারকম করার চেষ্টা কোরছেন। তাঁদের এই নানারকম করার চেষ্টাকে অন্ধকারে হাতড়ানো বোলে অপমান করবার মতো

দুঃসাহস আমার নেই, কিন্তু তবুও বোলব তাঁদের মনের এই অস্থিরতা তাঁদের ছবিতে প্রতিফলিত হোয়ে সার্থক রসসৃষ্টির পক্ষে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। মাখন দত্তগুপ্ত কোন্ দলভুক্ত সে কথাটা বিচার করার জন্যই এত কথা বলা। মাখনবাবুর চিত্রকর হিসাবে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত প্রথম দলে পড়েন না। কারণ শুধু রোমন্থনই তার ধর্ম নয়, গোড়া থেকেই ছবি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি কোরে যাচ্ছেন। তাঁর ছবিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও অস্থিরতা নেই। তাঁর ছবি দেখলে মনে হয় একজন

তেলরঙে আঁকা একটি প্রতিকৃতি।

আর্টিষ্ট নানা মেজাজে খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ছবি কোরে চলেছেন। এই ছবি এঁকে চলার মধ্যে অস্থিরতার বদলে রয়েছে সহজ এবং সুস্থ প্রচেষ্টা। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসাবে মাখনবাবুর খ্যাতির সূর্য যখন মধ্যগগনে সেই সময় তিনি

মাখনবাবুর আঁকা একটি লাইনো-কাট।

মাখনবাবুর আঁকা একটি পোষ্টার।

বৃত্তি গ্রহণ কোরলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের প্রধান শিক্ষক।

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনশিল্পে মাখন দত্তগুপ্তের মতো শিল্পীর হয়তো বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ্যাডভারটাইজিং থেকে তাঁর মতো শিল্পী বিদায় নেওয়ায় বেশ কিছু ক্ষতিই হলো। বৃত্তি হিসাবে কমার্শিয়াল আর্ট হয়তো অনেক বেশি অর্থকরী এবং ছবি আঁকার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার জন্য হয়তো শিল্পীকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার কোরতে হোয়েছে। কিন্তু তবুও বোলব শিল্পীর এই স্বধর্মনিষ্ঠা তাঁকে শিল্প-জগতের ব্রাহ্মণত্ব দান কোরেছে এবং তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত কোরেছে।

অকস্মাৎ এ্যাড্ভার্টাইজিং ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ্ আর্টের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। কমার্শিয়াল আর্টের স্বল্পপরিসর জগতে তাঁর শিল্পীমন হাঁপিয়ে উঠেছিল। যে শিল্পী ছবি আঁকার জন্য উদ্‌গ্রীব তার পক্ষে খবরের কাগজের ইঞ্চি-মাপা জায়গায় খদ্দেরের মন জুগিয়ে ছবি আঁকায় তৃপ্তি কোথায়? ছবি আঁকবার জন্য অখণ্ড অবসর এবং সুযোগ চাই। আর্ট কলেজের শিক্ষকের বৃত্তিতে এ সুযোগ সুপ্রচুর। তাই মাখনবাবু তাঁর পূর্বজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে নিয়ে শিক্ষকতার

মাখনবাবুর বাংলার পটের ঢঙে একটি বিজ্ঞাপনচিত্র।

অপরাজিত

জেড এইচ খান

প্রথমেই বলা দরকার, যে যেদিক দিয়েই দেখুন না কেন 'অপরাজিত' অসাধারণ ছবি। তবে 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় বোলতে বাধা নেই, অনেকটা নিষ্প্রভ। আজ অবধি এক 'পথের পাঁচালী' ছাড়া কোনো ভারতীয় ছবিরই নাম করা যায় না যা 'অপরাজিত'র সঙ্গে তুলনীয়। মাপকাঠি হলো 'পথের পাঁচালী'। অতএব প্রশ্ন ওঠে যে 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনা না কোরলে "অপরাজিত'র স্থান কোথায়?

'পথের পাঁচালী'তে যেমন, 'অপরাজিত'-তেও তেমনি সর্বজয়া এবং হরিহরের ভূমিকায় যথাক্রমে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হোয়েছেন। বর্তমান ছবির গল্পও অপুকে কেন্দ্র কোরে। কিন্তু 'অপরাজিত'র বড় কি ছোট, কোনো অপুই 'পথের পাঁচালী'র অপুর মতো অত সুন্দর অত প্রাণবান মনে হয় না। এবং সেই অপুর কতকগুলি বিশিষ্ট কথা-বার্তা, চলন-বলন প্রভৃতি এখানে অনুপস্থিত।

কলাকৌশলের উৎকর্ষের দিক থেকে বর্তমান ছবিটি তার আগের ছবির চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং ছবিটির আগাগোড়াই মুগ্ধ হবার মতো একটি আশ্চর্য শিল্পমাধুর্য পরিকীর্ণ। সম্ভবত এই কলাকৌশলের চমৎকারিত্বই ছবিটির শুভ্র সজীবতা, অকৃত্রিম সুর-সুষমা এবং নিখাদ স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকখানি ব্যাহত কোরেছে। ছবির কয়েকটি অতুলনীয় দৃশ্য দেখে দর্শক হয়তো বিমুগ্ধ হোয়ে পড়বেন, আত্মগতভাবে হয়তো বোলে উঠবেন, 'আহা, এই সেই বেনারস!' এই সব প্রশংসনীয় দৃশ্যগুলি শুধু দেখার নয়, জীবনের সুরে তারা স্পন্দিত। তাদের সেই প্রাণস্পন্দন কান পেতে শোনবার, একান্তভাবে অনুভব করবার। যে দৃশ্যে বেনারসের ব্যায়ামবীরের ব্যায়াম-চর্চা দেখানো হোয়েছে, সেই দৃশ্য ভালো ফটোগ্রাফির নিদর্শন শুধু নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু। ছবি কেবলি ছবি নয়, জীবনের মতো সত্যও। কিন্তু এই 'পালোয়ান'কে যখন একাধিকবার দেখা যায়, তখনই সেই সত্য আত্মগোপন করে, তখনই তা শুধুমাত্র ছবির মতোই নিষ্প্রাণ আর যান্ত্রিক মনে হয়।

সত্যজিৎ রায়ের ব্যবহৃত 'ইডিয়ম'গুলিও বেশি সুশ্লীল মনে হয়। অপুকে মনিবের জন্য তামাক-ছিলিম সাজতে দেখে সর্বজয়ার চাকরী ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর একটি প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত। এই ধরনের সুশ্লীল 'ইডিয়ম' অপ্রশংসনীয় না হোলেও অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং স্বভাবতঃই ছবির সাবলীল মাধুর্য ব্যাহত করে। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে 'অপরাজিত'কে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা মনে হোয়েছে, কয়েকটি ঘটনার কোল ছুঁয়ে যেতে মনে হোয়েছে। সময়ের কিংবা অনুপ্রেরণার অভাবই হয়তো এর মূল কারণ। এবং অনেক ক্ষেত্রে একই জিনিষ একাধিকবার দেখানো হোয়েছে, মনে হয় সময় কাটাবার উদ্দেশ্যেই এই পুনরাবৃত্তি। অপুর স্কুল-জীবন, তার কোলকাতায় থাকা এবং ছবির শেষ অংশ নৈরাশ্যজনকভাবে চিত্রায়িত হোয়েছে। গাঁয়ের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া যে ট্রেন দেখে সর্বজয়া তার নিঃসঙ্গ দিন কাটাতো, সেই ট্রেনের দৃশ্য দু-দুবার দেখানোর কোন

প্রয়োজন ছিল না। মানুষের চিন্তাধারায় পুনরাবৃত্তি আসতে পারে, আসেও, এবং তার কাজে-কর্মে অনিবার্য ধারা-বাহিকতাও খুব স্বাভাবিক, কিন্তু ছবিতে তাই বোলে তা বারবার দেখালে বিরক্তিরই উদ্রেক হয়। চলন্ত ট্রেন ছবিতে একাধিকবার না দেখালে যে সময়টুকু বাঁচতো, তা অন্যান্য অনেক কাজে লাগানো যেত।

'পথের পাঁচালী'র পরবর্তী অংশ হওয়াতে স্বভাবতঃই 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে 'অপরাজিত'র তুলনা এসে পড়ে। শৈশব এবং যৌবনের জরিফ্ লোলচর্ম ইন্দির ঠাকরুণ, এমন কি সেই কঠোরচরিত্র প্রতিবেশী যে দুর্গাকে চুরির জন্যে বকেছিল, তারা 'পথের পাঁচালী'কে জীবন্ত কোরে তুলতে অনেকখানি সহায়তা কোরেছিল, 'অপরাজিত'তে এই ধরনের জীবন্ত কোনো চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অপুকে দিয়ে পাকা চুল তোলাতো, একমাত্র সেই ধনী বৃদ্ধ জমিদার ছাড়া মহৎ আর 'জীবনের চেয়ে বড়' কোন চরিত্র অনুপস্থিত এ ছবিতে। অলস দুশ্চরিত্র সংগীতবিদ্, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী, কলেজের অধ্যাপক এবং অবশ্যই, অপুর ধূমপায়ী বন্ধুর মতো কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র আছে এখানে। কিন্তু এদের কেউই মনে দাগ কাটতে পারে না। মহৎ কাব্যে যে ধরনের চরিত্র আমরা আশা করি এদের কেউই সে-জাতীয় নয়, নেহাতই গদ্যময় সাধারণ এদের চরিত্র, মনে রাখবার মতো কোনরকম অসাধারণত্বে কেউই এদের চিহ্নিত নয়। এবং বড় ও ছোট, উভয় অপুরই চরিত্র এদের তুলনায় কাব্যময় ও অবাস্তব বোলে মনে হয়।

অপুর চরিত্রচিত্রণেও কিছু কিছু অসামঞ্জস্য বর্তমান। এই অসামঞ্জস্যের ফলে অপুর চরিত্র অসম্পূর্ণ। মার সঙ্গে অপুর কঠোর ব্যবহার, ট্রেন না পাওয়ার মিথ্যাভাষণ এবং মার জমানো টাকার প্রায় সবই নিয়ে যাওয়ার মতো নির্মমতায় অপুর চরিত্র বিমলিন, যদিও অপুর চরিত্র-বিবর্তনের পটভূমিতে এই সব দোষ স্বাভাবিক ও যথাযথ। কিন্তু ছবিতে এই দোষগুলি এত হালকা এবং ক্ষিপ্রভাবে দেখানো হোয়েছে যে এগুলি দৃশ্যকটুরকমের অসমঞ্জস। অবশ্য ট্রিটমেণ্ট ভালো হোলে এগুলি অসমঞ্জস বোলে মনে হতো না।

অপুর স্কুলের দিনগুলির চিত্রণও অসম্পূর্ণ। অথচ এই স্মরণযোগ্য দিনগুলি কত জীবন্ত কোরে তোলা যেত ছবিতে! ছবি দেখে মনে হয়, অপুর স্কুলজীবন একটি পরিশ্রমী এবং মেধাবী ছেলের স্কুলজীবন বই কিছু নয়। এবং দর্শকদের কজনই-বা সেই ভালো ছেলের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতার অংশীদার হবে! 'গ্লোবের' দৃশ্যানুক্রম বা সিকোয়েন্স এখনো চার্লি চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিকটেটারের,' কথা মনে কোরিয়ে দেয়। এবং এটা তাৎপর্যবিহীন ও জোর কোরে আনা হোয়েছে, মনে হয়।

তাই বোলছিলাম, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে 'অপরাজিত' অতুলনীয় সৃষ্টি হোলেও উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলির জন্যে পূর্বসূরী 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় তা অনেকখানি নিষ্প্রভ, অনেকখানি নিষ্প্রাণ।

গুজরাটের নৃত্য-নাট্য

'মেণা গুর্জরী'

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

গুজরাটের 'নটমণ্ডল'-অভিনীত নৃত্যনাট্য 'মেণা গুর্জরী'। গুজরাটের লোকগীতি ও নৃত্য-সমৃদ্ধ এই সুন্দর নাটকটি পরলোকগত শ্রীযুত মবলঙ্কর, প্রতিষ্ঠিত কলাবিদ্ রুক্মিণী-দেবী, শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জন কোরেছে।

সে বছর ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হোয়েছিল আমেদাবাদে। আমেদাবাদের উদ্যোক্তারা 'নটমণ্ডল'কে অনুরোধ কোরে 'মেণা গুর্জরী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে বোলে নিতে হয়, একটি গুজরাটি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন আমেদাবাদের নাগরিকরা খুবই অনুভব কোরেছিলেন। শান্তিনিকেতনের কলাতীর্থে শিক্ষার্থী হোয়ে তরুণ গুজরাটি যাতায়াত সুরু কোরেছিল। ধীরে ধীরে চাহিদা জাগলো মনে, আর সেই প্রয়োজনবোধ থেকে জন্ম নিল 'নটমণ্ডল'। 'নটমণ্ডল' বিভিন্ন সময়ে বহুনাটক অভিনয় কোরেছিল। ইবসেন ও শরৎচন্দ্রের অনুবাদ, পুরাণের 'উরুভঙ্গ', রায়ণোপর্বত, সবই তাঁদের অভিনয়ের তালিকাভুক্ত।

গুজরাটের নৃত্যনাট্য 'মেণাগুর্জরী'তে মেণা ও শাহাজাদা।

তবু 'মেণা গুর্জরী' তাঁদের একমাত্র নাটক, যা গুজরাটের লোক-সংস্কৃতিকে খানিকটা রূপায়িত কোরতে সমর্থ হোয়েছে।

এই গীতিনৃত্য-নাটিকার বিষয় বস্তু নেওয়া হোয়েছে প্রাচীন গরবা গান 'মেণা গুর্জরী' থেকে। একদা দিল্লীর বিদেশী শাসকের হানা পৌঁছেছিল গুজরাট পর্যন্ত। বিজয়ী শাসক গুজরাটের বুক দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা খুঁজেছিলেন রাজস্থান হোয়ে দিল্লী। সেই দিনের এক সরলা বালিকা মেণা। বাদশাহের ছাউনী পড়েছে গ্রামের প্রান্তে। পুরুষদের মুখে মুখে সেই বাদশাহী সমারোহের বর্ণনা শুনে গ্রামের মেয়েরা মেণাকে প্রলুব্ধ করে। বলে: "চলো, ছলনা কোরে দই বেচবার ভাণ কোরে দেখে আসি সেই ভাঁকজমক।" মেনার শাশুড়ী তাকে ভৎর্সনা করেন। বলেন: "বাদশাহ তোমাকে মহলে কয়েদ কোরে রাখবেন। তোমার রূপ সর্বনাশা।" তুমি যেও না—

"লস্কর মেঁ মৎ জায় রে—
দিল্লী শহর কা বাদশাহ তুঝে রাখে মহ্লান-মাঝ রে—"

কিন্তু মেণার কৌতূহল বাধা মানে না। সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রসাধন করে। প্রাচীন গীতির এই অংশে গুজরাটের গোয়ালিনী মেয়েদের প্রসাধনের যে বর্ণনা পাই তা আমাদের পদাবলীর রাধিকার অভিসার-সজ্জার মতোই রমণীয়। ফুল-ফাগুয়া ঘাঘরা, বিছুয়াতে ঝাঁঝরের ঝংকার, হাতে বাজুবন্ধ, কানে কলাফুল, কটিতে মেখলা, কণ্ঠে হার, নাকে মুক্তার নথ, চুলের বেণীর ফাঁকে ফাঁকে রূপার ফুল পরে মেয়েরা প্রস্তুত হন। তারপর মাথার ওপর ওপর তিনটি কলসীতে দই নিয়ে তাঁরা চলেন:

'চলী গুজরীয়া দুধ বেচ্নেকো আহ্ বাদশাহকে
দরবার রে—'।

গঢ়-গোকুল ছাড়িয়ে প্রান্তরের আম্রকুঞ্জে আসতেই কোন্ অমঙ্গলের আশঙ্কায় মেণার হৃদয় পূর্ণ হয়। সঙ্গিনীদের বিদায় দিয়ে সে অপেক্ষা করে। তখন প্রবেশ করেন বাদশাহ। মেণাকে বাদশাহ নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন। তাঁদের কথা বিনিময় চলে। যথা:

কাঁচ কথীর মেঁ ক্যা পহেরণা গোরী পহেরো
সোনা হার রে
—কাঁচ কথীর মেরা বৌত্ ভলা তেরে সোনে
লগা দউ আগ রে—

—কালী কমলমেঁ ক্যা ওঢ়না গোরী পহেরো
দখনী চীর রে—
—কালী কমল মেরে বৌত্ ভলা তেরে
চীরকুঁ লগা দউ আগ রে—
—মকুনা হাঁথী অজব বনা গোরী হাঁথী
দেখ্নে আও রে—
—তেরে হাঁথীমে ক্যা দেখ্না মেরে আঁগন
ভুরী ভৈঁস রে—

বাদশাহ বলেন: "আমার ষোল-শো রানীকে দেখতে এসো। গুজরাটের পুরুষদের চেহারায় শৌর্য নেই। আমার চেহারা একবার তাকিয়ে দেখো।"

মেণা উপহাস কোরে বলে:

তেরে মুঁছ্পেঁ ক্যা দেখ্না?
মেরে বকরে কী ঐসী পুঁছ্রে।

তখন ক্রীড়াচ্ছলে বাদশাহ মেণার দই ও দুধের কলসীগুলির দাম করেন।

—ছোটি মটকী কা মোল করো গোরী,
ইসকা কেয়া হায় মোল রে?

মেণা সদর্পে বলে:

—ছোটি মটকী কা মোল করুঁ, তেরা হাঁথী
হো কম তোল রে—
—দুসরী মটকী কা মোল করো গোরী
উসকা কেয়া হোয় মোল রে—
—দুসরী মটকী কা মোল করুঁ, তেরা তখ্ত
যায়গা ডোল রে—
—তিসরী মটকী কা মোল করুঁ গোরী
উসকা কেয়া হোয় মোল রে—
তিসরী মটকী কা মোল করুঁ তারী সারী
দিল্লী ডুল রে।

চকিত বাদশাহ বলেন:

—হিন্দুয়ানী তু বহুত বোলতি, বাদশাহ কো
দেতি জবাব রে—।

মেণা দেখে সন্ধ্যা সমাসন্ন। সে সঙ্গিনীদের সন্ধানে যেতে চায়। বাদশাহ তার পথ রোধ কোরে দাঁড়ালে সে সদর্পে জবাব দেয়:

গঢ় গোকুলকে যায় গোয়ালিন্ মৈণা মেরা নাম—
চন্দা পুরুষকে ঘরকে নারী বাত না করো হারাম॥

রূপমুগ্ধ বাদশাহ বলেন:

গুর্জর পৈ ক্যা মোজ হায় গোরী?
গুর্জর লোক গোয়াল—

মেণা বলে:

গুর্জর গুর্জরী বহুত ভলা মোরী শাহী লোগ্কা কাল।

। মেণার ভূমিকায় দীনা গান্ধী।

মেণা তারপর আত্মরক্ষার জন্য তার ছুরি খোঁজে, কিন্তু সেই ছুরি তার সঙ্গে নেই। সহজেই বাদশাহ তাকে বন্দী কোরে নিয়ে যান। ছাউনীতে মেণার সঙ্গিনীরাও বন্দী হয়েছে, এবং তাদের একসঙ্গে বাদশাহ দিল্লী নিয়ে চলেন। সংবাদ পেয়ে মেণার বীর দেবর হীরজীর নেতৃত্বে নয় লক্ষ গুর্জর পুরুষ বাদশাহকে আক্রমণ কোরে মেয়েদের উদ্ধার করে। তাদের প্রত্যাগমনের বার্তা পেয়ে গঢ়-গোকুলের নরনারী আনন্দে গ্রামকে উৎসব-

গুজরাটের নৃত্য-নাট্য
'মেণা গুর্জরী' নৃত্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য।

সজ্জায় সাজাতে সুরু করে। কিন্তু আনন্দের গানে গভীর বিষাদের সুর এসে পড়ে অজান্তে। গানের কথাগুলি আনন্দের, কিন্তু সুর বিষণ্ণ :

আজ মারে গঢ়রে তোরণ বন্ধাবো—
তোরণ বন্ধাবো নে শোরীয়ো বঢ়াবো—
শোরীয়ো বঢ়াবো নে পানীয়াঁ ছণ্টাবো—
পানীয়াঁ ছণ্টাবো নে ফুলয়াঁ বেরুহারো—

আনন্দের দিনে উৎফুল্ল নয়ন অশ্রুপূর্ণ হোয়ে আসে :

এক আঁখো হসতী নে বীজি আঁখো রুড়তী
বিজয় বন্ধাবনী মাতা হুঁ গাতী
আঁসুভরী মারী আঁখড়ী রাতি।

গানের মর্মার্থ বিফল হয়না। পরিপূর্ণ আনন্দমেলায় দাঁড়িয়ে মেণার শাশুড়ী ও ননদ তীব্র ভৎর্সনা করেন। বলেন : বাদশাহের ঘরে মেণা কি ভাবে জীবন কাটিয়েছে জানি না। তাকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগ্নহৃদয়ে মেণা তার রক্ষাকর্ত্রী দেবী মহাকালীকে কাতর আহ্বান জানায়। মহাকালী তার আহ্বানে সম্ভবত সাড়া দেন, কেননা মেণা সকলের চোখের সামনে থেকে পর্বতের প্রান্ত দিয়ে কোথায় চলে যায়, তাকে আর পাওয়া যায় না।

অনুতপ্ত গুর্জরীরা গঢ়-গোকুল ত্যাগ কোরে পাওয়া-গড়ে চলে যায়।

'মেণা গুর্জরী'র কাহিনীর সঙ্গে অনেকাংশে আমাদের দেশের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মলুয়া', এবং প্রাচীন চীনের লোকগীতি 'আশ্মা'র মিল আছে বোলে বোধ হয়। মরদেহ ত্যাগ কোরে বিলীন হোয়ে যাবার পরিণতি শেষোক্তটির মধ্যেও ছিল।

একটি প্রাচীন লোকগীতিকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা কোরতে কিছু কিছু অসুবিধা নটমণ্ডলের হোয়েছিল। এই ধরনের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও, প্রশংসার সঙ্গে বোলতে হয়, শিল্পীদের রূপ-সজ্জার যাথার্থ্যে এবং অভিনয়-দক্ষতায় 'মেণা গুর্জরী' যথেষ্ট সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন কোরতে সমর্থ হোয়েছিল। উদাহরণত বলা যায়, নীচের ছবিটির কথা। এই ছবিতে নায়কের হাতের এবং মুখভঙ্গিমায় যে একটি সুন্দর নাটকীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হোয়েছে, তা লক্ষ্য করার মতো। বেশ-ভূষা ও অলংকরণ সাধারণ সহজ ও স্বল্প হোয়েও যে কতখানি কালোচিত আবহাওয়া সৃষ্টি কোরতে পেরেছিল, তাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ কোরতে হয়। এ-সব নানাদিকে লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও অনেকাংশে তাঁরা মূল গরবার কথা ও সুর অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হোয়েছেন। এ-বিষয় তাঁদের সাহায্য কোরেছেন রসিকলাল পারিখ। এই সুযোগ্য কবি ও গীতিকার গুজরাটের লোকসংগীত নিয়ে অনেক চর্চা কোরেছেন। তাই তাঁর রচিত গানগুলির মধ্যে মধ্যযুগীয় গুজরাটের গ্রামীণ-জীবনের সহজ সুরগুলি এমন আন্তরিক হোয়ে ফুটে উঠেছে। মেহুলের সংগীত-যোজনার কৃতিত্বও সেখানে অনেকখানি। তাই আজো মনের কোণে বাজে—

'সোনানা আলমাঁ রতন কঙ্কাবটি কুঙ্কুম কেশর সাহেলী', 'সাহেলী মাহী বেচীনে, পাছে বেলী আয়, মেণা উভী একেলী, একেলাড়ী মুঞ্চায়,' এবং 'গুর্জর দেশে ভাণ কে গুজারী' প্রমুখ গানগুলি।

বাদশাহ এবং মেণার বাক্য-বিনিময় ও 'ফুল ফাগরানোঁ ঘাঘর মেঁ', 'রঙ্গনী ছোড়, রঙ্গিয়া বালমাঁ', 'কে কাবুল পর বাদশাহ চঢ়ে নে সারী', এই গানগুলি মূল গরবাতেই মিলবে।

নটমণ্ডলে সমবেত হোয়েছেন গুজরাট রঙ্গমঞ্চের কয়েকজন বিশিষ্ট গুণী। প্রবীণ অভিনেতা জয়শঙ্কর সুন্দরী, দীনা গান্ধী, রসিকলাল পারিখ। এঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন কোরেছে গুজরাটের নটমণ্ডল।

এই নাটকের নাচ ও অভিনয়ে প্রাচীন 'ভাওয়াই' পদ্ধতির ছাপ আছে। সম্ভবত ভাওয়াই'এর মতো 'মেণা গুর্জরী'ও একদা জন্ম নিয়েছিল রাজস্থানের আবু, ভীন্নামল ও যোধপুর অঞ্চলে। সেখান থেকেই লোকমুখে চলে এসেছে তারা গুজরাটে। এইরকম কোনো যোগসূত্র ব্যতীত, মূল গরবাটির ভাষার সংমিশ্রণের কারণ কি তা

'মেণাগুর্জরী'র একটি দৃশ্যে প্রস্তাবনাকালে নায়ক।

বোঝা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিকের এ সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে বোলে মনে হয়। এর পর ঐতিহাসিকের কাজ হোচ্ছে নাটকটির উৎপত্তি অনুসন্ধান করা। আমরা দর্শকমাত্র। সংগীত, নৃত্য ও পোষাকের বৈচিত্র্য, কুশলী অভিনয় ও সুষ্ঠু উপস্থাপনাতে 'মেণা গুর্জরী' কি চমৎকার লেগেছিল—তার রেশ এখনো প্রায়ই মনে পড়ে।

গুজরাটের নৃত্যনাট্য 'মেণা গুর্জরী'র সখীবৃন্দ।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিনিধি
ও
রথীন্দ্র মৈত্র

। হাত-পাখা হাতে গদীয়ান শ্রেষ্ঠী।

পরিতোষ সেনের চিত্র-প্রদর্শনী

আর্টিস্ট্রি হাউসে অনুষ্ঠিত শিল্পী পরিতোষ সেনের আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একটা কথাই বার বার মনে হোচ্ছিল যে শ্রীযুক্ত সেনের ছবির মধ্যে এমন একটা অনন্যতা এবং প্রাণবন্ত গতিশীলতা আছে যা দর্শকদের সচেতন না কোরে পারে না। নির্বোধ অরসিকরা অর্থহীন প্রশংসাই করুক বা পেশাদার শিল্পবিশেষজ্ঞরা বড় বড় টেক্‌নিক্যাল্ রেটরিকের তোড়ে শিল্পীর সব কিছু প্রচেষ্টাকে অক্লেশে নস্যাৎ কোরে দিক, তাতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক পরিতোষ সেনের শিল্পসাধনার মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

পরিতোষ সেন তথাকথিত ট্র্যাডিশনাল ধারার নকলনবিশ নন, সেই জন্য তিনি প্রগতিশীল এবং প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছবি আমাদের দেশের অন্যান্য মডার্ণ আর্টিস্টদের ছবির ভীড়ে হারিয়ে যাবে না। এদিক থেকে তিনি সত্যই অনন্য। এই প্রসঙ্গে হয়তো একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পরিতোষবাবুর কাজ 'আনকন্‌ভেন্‌শনাল্'। পুরাতনের নির্বিচার মক্স করার মতো দুর্বলতা থেকে তাঁর মন মুক্ত। তাই তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে সৃষ্টিধর্ম খুব ভালো কোরে লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া যা তাঁর ছবিকে বিশিষ্টতা দান কোরেছে সেটা হলো তাঁর ছবির 'লোক্যাল কালার'। আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক আধুনিক শিল্পীদের বেশির ভাগ ছবির মধ্যে এই স্থান-কাল-পাত্রের নিজস্ব কোনো বর্ণ বা গন্ধ থাকে না। ছবি দেখে বলা যায় না যে সেটি কামস্কাটকায় আঁকা না কাঠমাণ্ডুতে আঁকা। আধুনিক শিল্পীর ছবিতে কাশীর গলি আর মেক্সিকোর সহরতলীর গলি প্রায় একই চেহারা ধারণ করে। আমাদের ধারণা ছবির উপজীব্য মানুষজন স্থান কাল পারিপার্শ্বিকতার নিজস্ব বর্ণ এবং গন্ধের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতার উপর ছবির মূল্যায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। পরিতোষবাবুর ছবিতে এই

। বারবার বা নাপিত।

। বাবু স্মোকিং হুক্কা।

'লোক্যাল কালার' সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা এবং সচেতনতা অন্যান্য আধুনিক শিল্পীদের থেকে তাঁকে আলাদা কোরে রেখেছে।

প্রদর্শনীতে 'দি পেজেন্ট বয়', 'কনট্রাষ্ট', 'টয়লেট' এই তিনখানি ছবি পরিতোষবাবুর আগের কাজ। প্রদর্শনীর অন্য ছবিগুলির সাথে এগুলির কোনো সাদৃশ্যই নেই। পরিতোষ সেনের রসবোধ অত্যন্ত সুগভীর, বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ এবং পরিশ্রম করবার ক্ষমতা অসাধারণ। 'বারবার শপ' ছবিটি শিল্পীর রসবোধের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ছবিটির মধ্যে নাপিতের মুখে নির্বিকার পেশাদারী উদাসীনতার ভাব, কুরূপ খরিদ্দারের হাতের আয়নায় তার নিজের কাল্পনিক মূর্তির প্রতিফলন (অর্থাৎ সে নিজেকে যেমন সুন্দররূপে দেখতে চায়) দেখে আত্ম-প্রসাদের ভাব এবং অপর একজন অপেক্ষমান খরিদ্দারের সযত্ন গুম্ফ প্রসাধন প্রভৃতির মধ্যে শিল্পীর যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক-রসাশ্রিত জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা দর্শককে সত্যকার অনাবিল রসের আস্বাদ দেয়। পরিতোষ সেনের বহু ছবিতেই তাঁর এই রঙ্গপ্রিয় মনটির স্বাক্ষর আছে।

ছবিতে 'মুড' এবং পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে শিল্পী তাঁর কয়েকটি কাজে অপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'রামা হো' চিত্রটি এদিক থেকে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এবং আমাদের বিবেচনায় প্রদর্শনীর মধ্যে এইটিই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ চিত্র। সরল রেখা, বক্র রেখা, রং এবং টেক্‌নিক প্রভৃতির মারপ্যাঁচকে ছাড়িয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক ভাব সৃষ্টি হোয়েছে ছবিটিতে। অন্ধকার রাত্রের আকাশের তলায় জলন্ত কাঠের রক্তাভ উত্তাপকে ঘিরে একদল লোক বুঁদ হোয়ে ঢোল করতালের কলরোলের সাথে উদ্দাম ভজন গাইছে। ছবিটির কাছে দাঁড়ালে জলন্ত কাঠের রক্তাভ উত্তাপ যেন গা দিয়ে অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন ওদের ঐ উদ্দাম সমবেত সংগীতে আমিও যোগ দিই; আমিও করতালি মেলাই ওদের করতালের সাথে।

একই রকম ভাব ও অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় 'বাবু স্মোকিং হুক্কা' এবং 'দি ম্যান উইথ দি ফ্যান' ছবিতে। 'বাবু স্মোকিং হুক্কা' ছবিটিতে তাম্রকূটের আমেজী নেশায় মশগুল বাবুতন্ত্রের শেষ প্রতিনিধির (সম্ভবত) মুখমণ্ডলে গূঢ় সন্তোষের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি! 'ম্যান উইথ দি ফ্যান' ছবিটিতে ব্যজনরত ব্যক্তিটির হঠাৎ থতমত খেয়ে যাওয়ার মুহূর্তটিকে ধরে ফেলা হোয়েছে। কিন্তু পরিতোষ সেনের 'স্টিল লাইফ' গুলিতে রস এবং সজীবতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হলো।

প্রদর্শনী দেখে অনেকেই মন্তব্য কোরেছেন ছবিগুলির রঙের কম্বিনেশনের ব্যাপারে আর একটু বৈচিত্র্য থাকা উচিত ছিল। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য প্রায় সব ছবিতেই একই ধরনের, রঙের পৌনঃপুনিকতা একটু একঘেয়ে লাগে।

এ মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা একমত নই। বরং একথা বলা যায় যে পরিতোষবাবুর প্যালেটে অন্যান্য অনেক আধুনিক শিল্পীদের চেয়ে বেশি রং আছে। রঙের প্রয়োগে পরিতোষবাবু যথেষ্ট সাহস এবং সচেতনতা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন রঙের পরস্পর সংবদ্ধতা লক্ষণীয় এবং রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে পরিতোষবাবু খুব লজিক্যাল অথচ কৃপণ নন।

ছবির মধ্যে প্যাটার্ণ মেকিং-এর ব্যাপারে—রেখার ব্যবহারে পরিতোষবাবু অনেক বেশি স্বাধীন। ছবির মেজাজ এবং স্ট্রাকচার তৈরীর ব্যাপারে রেখাগুলি নানা ভঙ্গীতে নানা গতিতে চলাফেরা কোরে ছবির ভাবকে মূর্ত কোরেছে। পরিতোষবাবুর রেখা ব্যবহারের সহজতা একটা লক্ষণীয় বিষয়।

যাই হোক সব কিছু মিলিয়ে পরিতোষ সেনের চিন্তা অবিসংবাদীভাবে স্বাধীন গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত এবং বলিষ্ঠ। তাঁর ছবিতে 'ট্র্যাডিশনাল ধারার' অনেক ইডিয়াম তিনি ব্যবহার কোরেছেন প্রয়োজনমতো। পুরাতন ইডিয়াম ব্যবহার কোরেও নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় তা তিনি প্রমাণ কোরছেন। শিল্পীর মন এখনও হয়তো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি এবং যেহেতু এটা একটা অন্তবর্তী সময় সেইজন্য মনে হয় যে কি বোলতে হবে তা শিল্পী ঠিক কোরে ফেলেছেন অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কিন্তু বলবার পক্ষে কোনটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সেটা হয়তো এখনও স্থির কোরে উঠতে পারছেন না। জীবন এবং মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং তাঁর এই জীবন-সচেতনতা তাঁর ছবির দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দান কোরতে সমর্থ। তাঁর সব সৃষ্টি প্রচেষ্টাই সার্থক এবং সব ছবিগুলিই ভালো একথা হয়তো কেউই বোলবেন না, কিন্তু পরিতোষ সেনের শিল্প-সাধনার সম্ভাবনাময়তা সম্বন্ধে কারো পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

'রামা হো'।

একটি প্রতিকৃতি।

সুশীল সেন মহাশয়ের অঙ্কিত ডান পাশের এই প্রতিকৃতি-চিত্রটির কয়েকটি বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। মুখের মধ্যে বার্ধক্যের যে প্রশান্ত গাম্ভীর্যের ছায়াপাত ঘটেছে, তার নিরাভরণ সরল ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী। প্রতিকৃতিতে যে মুখ আঁকা আছে তার নিলিপ্ত নির্বিকল্প ঔদাসীন্য এবং দার্শনিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সুশীল সেনের চিত্র-প্রদর্শনী

শিল্পী শ্রীসুশীল সেন মহাশয় কোলকাতার সরকারী শিল্প শিক্ষালয়ের তথা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের সহপ্রধান শিক্ষক অর্থাৎ ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল। অধুনা একাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর উদ্যোগে উপরিউক্ত একাডেমির সাঁলোতেই তাঁর এই একক প্রদর্শনী শিল্পানুরাগীদের অনেককেই উৎসাহিত করে।

শ্রীযুক্ত সেনের বিভিন্ন অঙ্কন-পদ্ধতি, বিভিন্ন ও বিচিত্র মাধ্যমে এবং নানাবিধ অঙ্কন-ধারায় বিকশিত। তাঁর টেম্পারা, তেলরং, জলরং, এবং এচিং, উড্‌কাট্ ও লিথো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। একবার উক্ত শিল্পীর কুশলী হস্ত নানা বিভিন্ন ধারা ও মাধ্যমে যে শিল্পসৃষ্টি রচনা কোরেছে তা স্বতঃই সাধারণকে মুগ্ধ কোরতে যে সক্ষম এ ধারণা করা বোধ হয় ভুল হবে না। তাঁর বহুবিধ আঙ্গিক আয়ত্ত করার ক্ষমতাই সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য। এ কথা বলবার একটা বিশেষ তাৎপর্য এই যে তাঁর সৃষ্টি বিভিন্ন আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেলেও তদ্দ্বারা কোথাও বে-সুর অথবা ছন্দ-পতন ঘটায়নি। তাঁর সবগুলি সৃষ্টিতেই বেশ একটা সমভাব বিরাজমান। বস্তুত, এ-হেন দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমতা অধুনা খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত সেনের শিল্পকলায় তাঁর আঙ্গিকের নিজস্বতা কোথাও উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ কোরেছে বোলে মনে হয় না। তাঁর ছবিগুলি দেখলে মনে হয়—কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর সৃষ্ট শিল্পের পরিবেশকে বাদ দিয়ে নিজস্ব বিশেষ কোনো শৈলীকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে মোটেও চেষ্টিত

নন। আজকের দিনে এই সংযম এবং এ ধরনের সহজ সরল প্রকাশ ও নিষ্ঠা সচরাচর বড় একটা নজরে পড়ে না। শ্রীযুক্ত সুশীল সেনের শিল্পকৃতিতে ভারতীয় আত্মস্থতার যে সুন্দর ভাবৈশ্বর্য বিকিরিত, তা সত্যই এক দুর্লভ সদ্‌গুণের পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত সেনের কাজ ভবিষ্যতে আরো বলিষ্ঠ ভাব ও নিজস্বতায় পরিস্ফুট হোয়ে উঠবে একথা নিশ্চিত আশা করা যায়। এই সঙ্গে তাঁর চিত্রের কয়েকটি প্রতিলিপি দেওয়া হলো। আশা করি এগুলি পুনর্বার সাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হবে। —রথীন্দ্র মৈত্র।

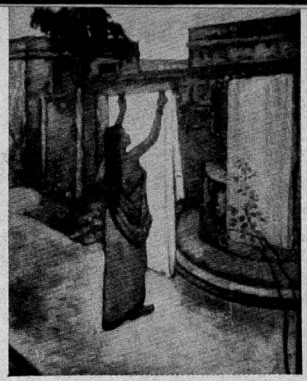

কাপড় শুকানো।

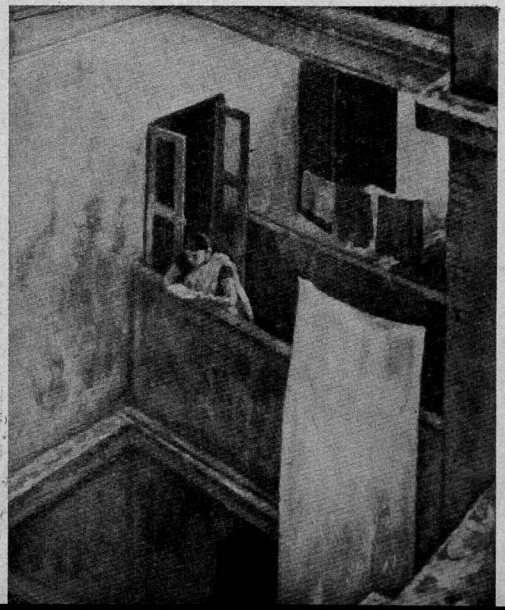

অলিন্দায় দণ্ডায়মানা কৌতূহলী পুরনারী।

গুরুচরণ সিং-এর মৃৎপাত্রের প্রদর্শনী

সম্প্রতি কোলকাতায় গুরুচরণ সিং-এর মৃৎপাত্রশিল্পের (পটারি) প্রদর্শনী হোয়েছিল। গত চল্লিশ বৎসর ধোরে গুরুচরণ সিং মৃৎশিল্পে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছেন। ১৯১৯ সালে তিনি মৃৎশিল্পে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য জাপান, চীন ও কোরিয়ায় যান। ১৯২২ সালে ভারতে ফিরে এসে দিল্লীর একটি টালির কারখানায় যোগদান করেন এবং পনের বৎসর যাবত সেখানে কাজ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি দিল্লীতে 'নীল মাটির শিল্প' নামে তাঁর স্টুডিয়ো খোলেন। মোগলযুগে প্রাচীন দিল্লীর 'নীলমাটির শিল্প' উৎকর্ষের চরমে পৌছেছিল। লুপ্তপ্রায় এই শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবনায়নই গুরুচরণ সিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গুরুচরণ সিং-এর শিল্পকৃতি সম্পর্কে বলা হোয়েছে: His work covers a wide range from the traditional basic forms to the modern experimental ones. এ কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য বোলে মনে হয়। তবে তাঁর শিল্পকৃতির উপাদান ভারতীয় হোলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঠনরূপ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। ভারতীয় মৃৎশিল্পের গঠনরূপের ঐতিহ্য তিনি খুব কমই অনুসরণ কোরেছেন। প্রসঙ্গত, হবিবুর রহমানের 'গান্ধী-ঘাটের' (বারাকপুর) উল্লেখ করা যায়। এই গান্ধীঘাটের গঠনরূপ আধুনিক হোলেও দর্শকের মনে ভারতীয়ত্বের পরিবেশ সঞ্চার কোরতে সক্ষম, কারণ তা আধুনিক হোয়েও ভারতীয়, এবং প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের আবশ্যকীয় গঠনরূপের ছায়া তাতে অবশ্যই অবলোকন করা যায়। শিল্পীর কৃতিত্ব তো এইখানেই। গুরুচরণ সিং প্রথাসিদ্ধ গঠনরূপে কোন কাজ যে করেননি তা নয়, কিন্তু পরীক্ষামূলক ব্যাপারে আধুনিকত্ব দেখাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি পাশ্চাত্য গঠনরূপের কথা মনে কোরিয়ে দিয়েছেন। তবু বোলব, তাঁর এ-উদ্যম প্রশংসনীয়। একটি লুপ্তপ্রায় দেশজ শিল্পের পুনরুদ্ধারে তাঁর চেষ্টা সফল হোক, প্রার্থনা করি। এ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কথা হোচ্ছে যে—সম্প্রতি 'নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা' শ্রীগুরুচরণ সিং-এর অধীনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ কোরেছেন।

। গুরুচরণ সিং-এর প্রদর্শিত মৃৎশিল্পের কয়েকটি নমুনা।

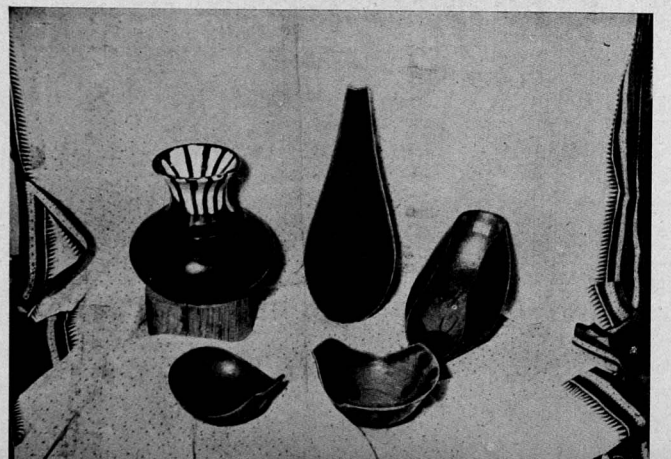

। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহের—বাংলার একটি প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও সদারং সংগীত সম্মেলন

বিষ্ণু উপাধ্যায়

সংগীতের আবেদন সার্বজনীন। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালেই সংগীত জন্ম লাভ করে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ বা মার্গ সংগীতের ধারা সৃষ্ট হয়। সংগীত-সাধকদের বংশানুক্রমে বা শিষ্য পরম্পরায় সেই ঐতিহ্যের ধারা আজও প্রবহমান। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিভাবান শিল্পী মূল ধারাটি বজায় রেখে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন কোরেছেন; তাহলেও আজকের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রাচীনকালে সৃষ্ট রাগরাগিণীর মূল ধারাটি বজায় আছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের আবেদন আজও অনস্বীকার্য। যদিও আগেকার কালের রাজা-বাদশাহরা, যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা কোরতেন, তাঁরা আজ আর নেই, জমিদারীপ্রথা বিলোপের ফলে ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হোয়েছে, তবু আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের জনসাধারণ আজ এগিয়ে এসেছে তাঁদের সামর্থ্য আর আগ্রহ নিয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীদের বাঁচিয়ে সেই প্রাচীন মূল্যবান ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের রসপিপাসু শ্রোতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এ কম উৎসাহের কথা নয়!

কোলকাতায় সম্প্রতি (২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ১৯৫৬) অনুষ্ঠিত সদারং সংগীত সম্মেলনের তৃতীয়

॥ তন্দরম্

ঝরোদ বাজাচ্ছেন শ্রীমতী শরণরানী মাথুর।

তাছাড়া সেদিন অধিক মূল্যে প্রবেশ্যধিকারলিপ্সু শ্রোতাদের সংখ্যা থেকেও বোঝা যায় যে আগ্রহান্বিত সংগীতরসিক শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে।

গতবছর ও তার আগের বছর সদারং সংগীত সম্মেলনের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ভবানীপুরের একটি চিত্রগৃহে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল; তাতে দেখা গিয়েছিল যে সারারাত্রি ধরে অগণিত নরনারী (তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা) চিত্রগৃহের বাইরে বসে, দাঁড়িয়ে (অপেক্ষমান মোটরের ভিতরে এবং পাদানীতে, রিক্সায়, বাসে, ফুটপাতে, মায় ট্রাম লাইন পর্যন্ত ভর্তি কোরে) অনুষ্ঠান শুনেছেন। কোলকাতার ইতিহাসে উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনপ্রিয়তার এ এক অভূতপূর্ব রেকর্ড। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সদারং সংগীত সংসদের কর্তৃপক্ষ এবছর অধিক সংখ্যক শ্রোতার সুবিধার্থে বিরাট মণ্ডপ কোরে অধিবেশনের আয়োজন করেন এবং তা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। বেশি সংখ্যক শ্রোতার ব্যবস্থা কোরতে পারার জন্য তাঁরা টিকিটের মূল্যও কম কোরেছিলেন। সাধারণ সংগীত সম্মেলনের আর একটি নিয়মের ব্যতিক্রমও তাঁরা কারেছিলেন—সেটি হোল এই যে প্রথম কয়েকদিনের অধিবেশন তাঁরা শেষ কোরেছিলেন মধ্যরাত্রের কিছু পরে এবং কেবল শেষ দিনের অনুষ্ঠান চলেছিল ভোর পর্যন্ত। রাত্রিশেষের আগে অনুষ্ঠান শেষ হোয়ে যাওয়ায় সাধারণ শ্রোতাদের বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ কোরতে হয়নি; কারণ, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পরিবহন বিভাগের সঙ্গে সহরের বিভিন্ন দিকে যাবার জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা কোরেছিলেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত কয়েকটি লাইনের ট্রামও চালু ছিল।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনপ্রিয়তায় এবং প্রসারকল্পে সদারং সংগীত সংসদই প্রথম এই পথ দেখালেন এবং এজন্য তাঁরা কোলকাতার সংগীতরসিকদের ধন্যবাদার্হ হোয়েছেন।

এবারের অধিবেশনের সর্বভারতীয় শিল্পী সমাবেশও বেশ ভালোই হোয়েছিল। এবিষয়ে প্রথমেই সম্মেলনের কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ দিতে হয় এইজন্য যে তাঁরা শ্রীমতী মঘুবাঈ কুরদিকারের মতো গুণী শিল্পীর গান শ্রোতাদের শোনাবার ব্যবস্থা কোরেছেন। কোলকাতায় শ্রীমতী কুরদিকার এই প্রথম সাধারণকে গান শোনালেন। এই

খেয়াল গাইছেন তারাপদ চক্রবর্তী।

বার্ষিক অধিবেশনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবারে বিরাট মণ্ডপে প্রায় তিনহাজার লোকের আসনের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও প্রতিদিনই বহু লোক বাইরের রাস্তা থেকে সংগীত শুনেছেন।

। কথক নৃত্যে বিরজু মহারাজ।

সঙ্গে তাঁর প্রতিভাশালিনী কন্যা কুমারী কিশোরীবাঈ আমনকরের গান শোনার সুযোগও হোয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে শ্রীমতী কুরদিকার 'শুধ কল্যাণ' ও 'শাওন কল্যাণ' রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গান করেন। এঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন সংগীতে এঁর সুযোগ্যা কন্যা, তবলায় সদানন্দ আমনকার এবং সারেঙ্গীতে দত্তরাম পর্বতকার। ষষ্ঠ অধিবেশনে তিনি 'মারু বেহাগ' ও 'শুধ্ নটে' খেয়াল গান। ইনি আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের ঘরোয়ানার শিল্পী এবং তিনি তাঁর অনুষ্ঠানে তার সুযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এঁর কন্যা কিশোরী-বাঈ-এর গান (যদিও অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল না) দুটি অধিবেশনে শোনার সুযোগ সকলের হোয়েছে। তৃতীয় অধিবেশনে ইনি 'নন্দ' রাগে খেয়াল ও 'দেশ' রাগে ঠুংরী এবং চতুর্থ অধিবেশনে (সকালে) 'ভৈরো' ঠাটের 'বিভাস' ও 'শুধ্ সারং' রূপক ও ত্রিতালে গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁর গানে মায়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তরকালে ইনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরবেন বোলে আশা করা অন্যায় হবে না।

লাহোরের ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব বর্তমান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর গান অবশ্য কোলকাতার সংগীতরসিকরা বহুবার শুনেছেন। কিন্তু তবুও তাঁর গানের এমনই আকর্ষণী শক্তি আছে, যাতে তা কোনদিনই পুরানো লাগে না। এবারের সম্মেলনীর পঞ্চম অধিবেশনে তিনি প্রথমে 'দরবারী কানাড়া'য় যে খেয়াল গানটি করেন, তা অপূর্ব হোয়েছিল।

এঁর সঙ্গে সহযোগিতা কোরেছিলেন সংগীতে এঁর সুযোগ্য পুত্র, তবলায় কেরামত খাঁ, হারমোনিয়ামে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং সারেঙ্গীতে লড্ডন খাঁ। দরবারী কানাড়ার পর তিনি 'আড়ানা'য় তাঁর বিখ্যাত গান 'কানে কুণ্ডলয়া' গান, তারপর একটি ঠুংরী এবং তাঁর আর-একটি সুমধুর গান 'বাজুবন্দ খুলু খুলু যায়' গানটি গান। সপ্তম অধিবেশনে অর্থাৎ শেষ দিনে তিনি ঝুমরা তালে 'বাগেশ্রী' রাগে বিলম্বিত খেয়াল, ত্রিতাল দ্রুত ও তারানা, বাহার ত্রিতাল দ্রুত এবং 'আয়ে না বালম' ও 'হরি ওম্' ভজনটি গান।

। সংগীতে বিভোর বড়ে গোলাম আলী।

। নৃত্যরতা রোশনকুমারী।

বাইরের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাইয়ের ওস্তাদ আমীর খান, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতের অধ্যাপক শ্রীশিবকুমার শুক্লা এবং বেনারসের শ্রীমতী গিরিজা দেবী। এঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ কোরতে হয় আমীর খান সাহেবের কথা। তিনি এবার শ্রোতাদের মুগ্ধ কোরেছেন তাঁর সংযত, সুমিষ্ট সংগীতের গায়কী, বন্দেশ ও সুরবিস্তারের মাধুর্যে। আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যও ইনি শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেন। তৃতীয় অধিবেশনে ইনি

প্রথমে 'শুধ্ কল্যাণে' বিলম্বিত ও দ্রুত, 'আভোগী কানাড়া'য় মধ্যরাগের খেয়াল ও তারানা ও দাদরা গান এবং সপ্তম অধিবেশনে ঝুমরা তালে 'মালকোষ' বিলম্বিত, ত্রিতালে দ্রুত এবং 'চন্দ্রকোষ' তারানা গান। সপ্তম অধিবেশনে এঁর অনুষ্ঠান খুবই উচ্চাঙ্গের এবং সংগীতরসিকদের বিশেষ উপভোগ্য হোয়েছিল। শ্রীশিবকুমার শুক্লা দ্বিতীয় অধিবেশনে 'যোগ' রাগে খেয়াল এবং 'মধুকোষ' ও 'কাফী' গান। পঞ্চম অধিবেশনে ইনি 'দুর্গা' রাগে শিবপদ ও খেয়াল, মারোয়া ঠাটের 'সাঝ' নামে একটি রাগের ত্রিতাল এবং হংসধ্বনিতে 'তারানা' গান। তাঁর 'যোগ' রাগের দিন মনে থাকবে। ষষ্ঠ অধিবেশনে ইনি 'আভোগী কানাড়া' খেয়াল, সিতারখানি তালে খাম্বাজ টপ্পা, 'মুরলি নাকি বাজায়ে শ্যাম' খাম্বাজ ঠুংরী এবং একটি 'গারা' দাদরা গান। তিনটি অধিবেশনে এঁর গান হয়। সপ্তম অধিবেশনের প্রথমে ইনি 'ইমন কল্যাণে' বিলম্বিত ও দ্রুত, 'বাসন্তী' এবং শেষে একটি গারা ঠুংরী গান।

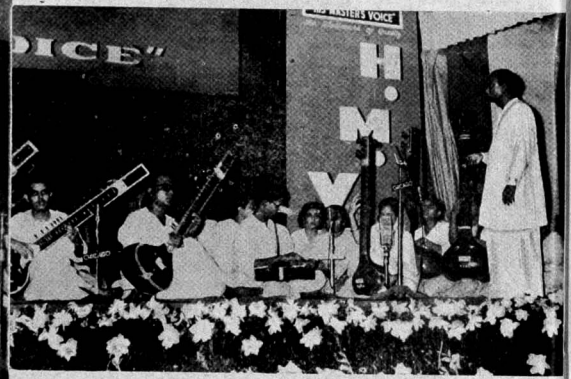

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠসংগীতে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, এ. কানন, পণ্ডিত মনিরাম ও তাঁর ভ্রাতা পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণ এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সংগীতে শ্রেষ্ঠ আসন

বামে স্বরোদ বাজাচ্ছেন আলি আকবর। তবলায় কিষেণ মহারাজ। ডাইনের ঐকতান বাদনে আলি আকবর।

অধিকার কোরেছেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি 'পুরিয়া কল্যাণ' রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল এবং একটি ঠুংরী গান। ঠুংরির চেয়েও খেয়াল গানেই তিনি নিজের ক্ষমতা ভালো দেখাতে পারেন। অন্যান্যদের অনুষ্ঠান ভালোই হোয়েছিল।

খেয়াল এবং 'তারানা' গানটি শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। গিরিজা দেবীর গান একদল শ্রোতা খুবই উপভোগ করেন। ইনি রবিবার সকালে চতুর্থ অধিবেশনে 'মধুবন্তী' রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, 'বাবুল মেরা' ভৈরবী ঠুংরী এবং একটি ভৈরবী দাদরা গান। এঁর কণ্ঠে 'বাবুল মোরা' গানটি আমি দু'বছর আগে আলাউদ্দীন সংগীত-সমাজের সম্মিলনীতে শুনেছিলাম। গানটি হোয়েছিল ভোর পাঁচটার সময়। রাত্রিশেষ এবং নবপ্রভাতের সন্ধিক্ষণে ওই গানটি সুরের এমন অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার কোরেছিল, যা অনেক

যন্ত্র সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার, আলি আকবরের স্বরোদ, শ্রীমতী শরণরাণী মাথুরের স্বরোদ এবং 'আলি আকবর কলেজ অফ্ মিউজিক'এর সমবেত ঐকতান বাদনই ছিল প্রধান। রবিশঙ্কর বা আলি

। বেনারসের শ্রীমতী গিরিজা দেবী।

আকবরের যন্ত্রসংগীতের গুণগ্রাহী নয়, এমন লোক বোধহয় সংগীতরসিকদের মধ্যে নেই। একজন সেতারে আর একজন স্বরোদে যে সুরলোক সৃষ্টি করেন তা অপূর্ব। রবিশঙ্কর তৃতীয় অধিবেশনে দক্ষিণ ভারতীয় 'বাচস্পতি' রাগে আলাপ ও ত্রিতালে 'জিলা গৎ' বাজান এবং সপ্তম (শেষ) অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে 'রামকেলী' রাগে আলাপ ও দক্ষিণ ভারতীয় 'মলয় মারুত্তম্' রাগে গৎ বাজান। এই অধিবেশনের সর্বশেষে তাঁর অনুষ্ঠান ছিল। সারা রাত্রির পর তাঁর দীর্ঘ আলাপ অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। অত দীর্ঘ না কোরে তিনি যদি আর একটু সংযত হোতেন, তাহলে তাঁর অনুষ্ঠান আরও মাধুর্যমণ্ডিত হতো। আলি আকবর খাঁ সাহেব প্রথম অধিবেশনে 'দরবারী কানাড়া' রাগে আলাপ, 'মাড়োয়া' রাগের ত্রিতাল গৎ ও মাঝ-খাম্বাজ বাগে ধূণ বাজিয়ে এবং পঞ্চম অধিবেশনে 'হেম বেহাগ' রাগে ধামার ও ত্রিতালে জিলা বাজিয়ে সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। তাঁর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি কথা বলার আছে। তা হোল এই যে, তাঁর দু'দিনের অনুষ্ঠানেই বাজনার মাঝে মাঝে কয়েকবার স্বরোদের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় অনুষ্ঠান উপভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি কোরেছিল। সুরসৃষ্টির সম্পূর্ণ রূপটি এরকম ঘন ঘন ব্যাহত না হোলে তাঁর অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশি উপভোগ্য হতো। ষষ্ঠ অধিবেশনে আলি আকবর পরিচালিত 'আলি আকবর কলেজ অব্ মিউজিক'এর প্রায় ষাটজন ছাত্র-শিল্পী দক্ষিণ ভারতীয় 'কিরবানি' বাগে ঐকতান বাজিয়ে সকলকে আনন্দদান করেন। এই ঐকতানে ছিল স্বরোদ, সেতার, বাঁশী, তবলা এবং একটি গীটারও। এরকম অনুষ্ঠান সচরাচর হয় না, এবং বিশেষ কোরে আলি আকবরের মতো প্রতিভাশালী শিল্পীর পরিচালনায়। তাই সমগ্র অধিবেশনের

শ্রীমতী মঘুবাঈ কুরদিকার ও কুমারী কিশোরীবাঈ আমনকর।

মধ্যে এটি একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। ঐকতান বাদনের এই অনুষ্ঠানটি মোটের উপর ভালোই লেগেছিল। দিল্লীর শ্রীমতী শরণরাণী দ্বিতীয় অধিবেশনে কিরবাণি রাগে স্বরোদ বাজান এবং চতুর্থ অধিবেশনে 'নট ভৈরোঁ' ও 'ভৈরবী ঠুংরী' বাজান। প্রথম দিন এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন কেরামত খাঁ এবং দ্বিতীয় দিন তবলা সঙ্গত করেন আল্লা রাখা। শ্রীমতী শরণরাণী স্বরোদের যাদুকর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এবং আলি আকবর খাঁর কাছে

। খেয়াল শুরু কোরেছেন আমীর খান।

। খেয়াল গাইছেন শিবকুমার শুক্লা।

শিক্ষালাভ কোরেছেন। তাঁর অনুষ্ঠানে তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁর হাত বেশ মিষ্টি ও পরিষ্কার।

তবলা বাদকদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ কোরব লক্ষ্ণৌএর শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যের কথা। কারণ এঁর অনুষ্ঠান আমাদের আগে শোনার সুযোগ হয়নি ; কিন্তু এবারে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে সকলেই খুশী হোয়েছেন। আল্লা রাখা, ও কিষেণ মহারাজ নিজেদের সুযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এবার নৃত্যানুষ্ঠানের কথা। লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ কাল্‌কাবিন্দ

।সেতারের যাদুকর রবিশঙ্কর।

ঘরাণার আচ্চন মহারাজের সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিরজু মহারাজের কথক নাচের অনুষ্ঠান প্রত্যেকেরই প্রশংসা অর্জন কোরেছে। সত্যিকারের কথক নাচের রূপটি তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন ; তবে এর শরীর আর একটু হাল্‌কা হোলে তিনি মনে হয় নিজেকে আরও ভালোভাবে প্রকাশ কোরতে পারতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ইনি ত্রিতালে কথক নৃত্য করেন ; এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন কিষেণ মহারাজ। তাঁর পরের অধিবেশনের অনুষ্ঠানে 'রাসলীলা' ও 'কালীয় দমন' নৃত্য দুটি খুবই উপভোগ্য হোয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেন আল্লা রাখা। বোম্বাইয়ের রোশন-কুমারীও এই অধিবেশনে দুদিন কথক নৃত্য প্রদর্শন করেন। তবে এঁর নাচ খাঁটি কথক নয়, কারণ তার সঙ্গে অন্যান্য নাচের মিশ্রণ দেখা যায়। তার ফলে অবশ্য তাঁর অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হোয়েছে। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘসময় একাদিক্রমে নৃত্য প্রদর্শন কোরতে পারেন। এর সঙ্গে সঙ্গত করা কঠিন কাজ। তৃতীয় অধিবেশনে ইনি ত্রিতালে কথক নাচেন। এঁর পিতা ফকির মহম্মদ খাঁ এঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করেন এবং তবলা সঙ্গত করেন আল্লা রাখা। ষষ্ঠ অধিবেশনে ইনি ত্রিতাল ও ঝাঁপতালে নাচেন এবং সেদিন তবলা সঙ্গত করেন শ্রীকিষেণ মহারাজ। এবছরের সংগীত সম্মিলনীগুলির মধ্যে সদারং সংগীত সম্মিলনীই প্রথমে অনুষ্ঠিত হলো। এর পর আরও কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মিলনী কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। সূচনা তো বেশ ভালোই হোয়েছে। আশা করা যায় সেগুলিও সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং সেগুলিতে ভারতের অন্যান্য প্রখ্যাত প্রতিভাবান শিল্পীদের সংগীত শোনার সুযোগ পাওয়া যাবে। এইভাবে দিনে দিনে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত আরও প্রচার ও প্রসার লাভ কোরবে, তা নিশ্চয়ই আশা করা যায়। ভারতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ যে উজ্জল—তাতে সন্দেহ নেই।

আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। —রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় নিখিলভারত প্রকাশন প্রতিযোগিতা

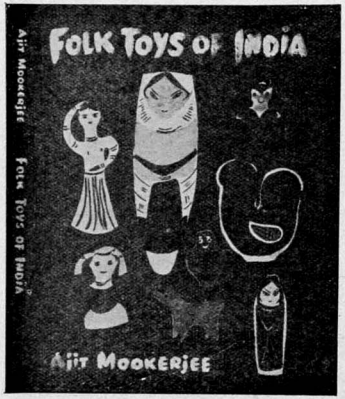

বাংলা বইয়ের মান দিন দিন বাড়ছে। এবারকার নিখিল ভারত প্রকাশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্তদের তালিকাই তার প্রমাণ।

বই পাঠযোগ্য হয় শুধু লেখার গুণে নয়, প্রকাশনার গুণে। সত্যি বোলতে গেলে, লেখকরা বই লেখেন না—শুধু লেখেন। সে লেখা ছেপে বাঁধিয়ে বই কোরতে হয়। এই বই করার নামই হল প্রকাশন-শিল্প।

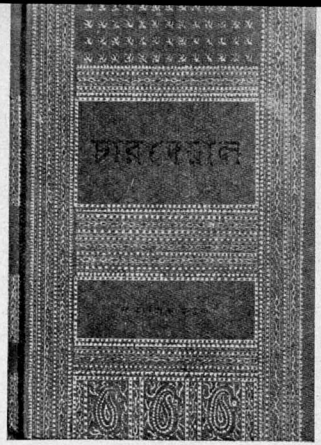

লেখকের হাত আর পাঠকের হাত—দু'হাত এক করাই হলো প্রকাশকের কাজ। প্রকাশনার কাজে খুঁত থাকলে লেখাও ক্ষুণ্ণ হয়। ভেতরের লেখা ভালো হোলেও অনেক সময় বইয়ের বাইরের চেহারা পাঠককে কাছে না টেনে দূরে সরিয়ে রাখে।

পাঠককে টানার ব্যাপারে বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা

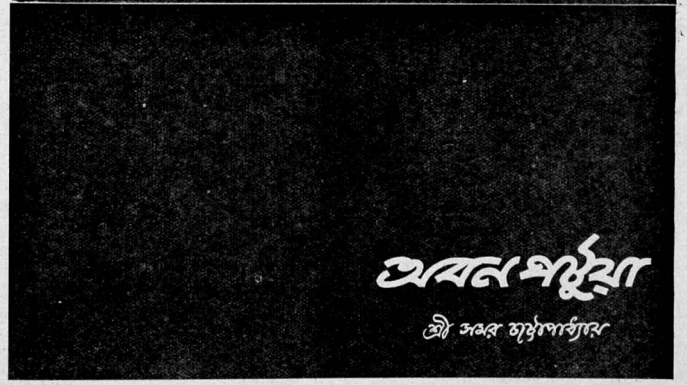

যে আজ অমনোযোগী নন, বইয়ের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়ালেই তা টের পাওয়া যায়। অনেক মলাট দেখতে-দেখতে মনে হয়, বইয়ের ছবি না হোয়ে ক্যালেণ্ডারের ছবিও হোতে পারতো।

বই জিনিসটা ঘর সাজানোর উপকরণ নয়। বই পড়বার জন্যে। পাঠক পাকড়াবার আগ্রহে অনেক সময় এই কথাটাই ভুলে যাওয়া হয়। বই দেখে পাঠকেরা যাতে পড়বার উৎসাহ পান, তা দেখতে হবে। কিন্তু প্রকাশন-শিল্পের কাজ সেখানেই শেষ নয়। দেখতে হবে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন সেই উৎসাহ বজায় থাকে। পড়তে-পড়তে পাঠক যেন কোথাও বাধা না পান।

এক কথায়, শুধু মলাট নয়—ছাপা, কালি, হরফ, কাগজ সব কিছুর মধ্যেই প্রকাশনার নৈপুণ্য থাকা দরকার।

সেই প্রকাশন-শিল্পই সার্থক, যা বইয়ের সর্বাঙ্গে লেখকের অন্তরকে তুলে ধরে। প্রকাশকের চোখ যেমন পাঠকের দিকে থাকবে, তেমনি লেখকের প্রতিও যেন অন্ধ না হয়।

নিখিল ভারত প্রকাশন প্রতিযোগিতা বাংলা বইয়ের বহিরঙ্গের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে প্রকাশকদের সাহায্য কোরবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার রংচঙে ছবি, ভালো ছাপা, দামী কাগজ, ভালো বাঁধাই একসঙ্গে যোগ কোরলেই উচ্চাঙ্গের প্রকাশন-শিল্প হয় না। প্রকাশন-শিল্পের সব চেয়ে বড় কথাই হলো সুচিন্তিত পরিকল্পনা—প্রকাশনার সমস্ত অঙ্গকে মিলিয়ে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপবান শরীর দেওয়া। দুঃখের বিষয়, বাংলা বইয়ের বেশিরভাগ প্রকাশকই আজও এ বিষয়ে উদসীন।

যে সব বাংলা বই এবারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হোয়েছে, নীচে তার একটি তালিকা এবং সেইসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রকাশন-পরিচয় দিলাম। —**সুভাষ মুখোপাধ্যায়।**

প্রথম ধারা। কিশোর সাহিত্য (১০ বছরের নীচে)

প্রথম পুরস্কার। নিজে পড়ো
মুদ্রক, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলিকাতা
প্রকাশক, শিশুসাহিত্য সংসদ কলকাতা

সাইজ: ৭½ × ৯½ ইঞ্চি। অক্ষর পরিচয়ের জন্য অঙ্কিত বড় টাইপ, ডবল গ্রেট ও টু-লাইন পাইকা। সাদা কাগজ। দু'রঙা অফসেট কমলা রং ও কালো। মলাট বাফ্ কাগজে, চার রঙে। মোট পৃষ্ঠা ৪৮

প্রচ্ছদপট ও ছবি—প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি বহুসংখ্যায়।

অফসেটে পরিচ্ছন্ন ছাপা, কিন্তু সজ্জা-পরিকল্পনা মামুলী ও বৈচিত্র্যহীন। অঙ্কনপদ্ধতিতে অনুপ্রেরণার অভাব, দুই রঙের সংমিশ্রণে আরো নানা রঙের প্রকাশ সম্ভব ছিল। প্রচ্ছদে ও নামপত্রে অক্ষর-অঙ্কন শ্রীহীন এবং অক্ষর পরিচয়ের টাইপের সঙ্গে সংগতিরক্ষার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি।

দ্বিতীয় পুরস্কার। ছড়া ও ছবিতে এ-বি-সি
মুদ্রক, নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা
প্রকাশক, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা

সাইজ: ক্রাউন ১।৪। ৮×৬ ইঞ্চি। অক্ষর পরিচয়ের ইংরেজী টাইপ ৬০ পয়েণ্ট ও ১৮ পয়েণ্ট। বাংলা টাইপ: গ্রেট ও পাইকা। সাদা কাগজ। টাইপ কালো, ছবি সবুজ, লাল বা কমলা রঙে। মলাট সাদা ডুপ্লেকস জাতীয় বোর্ডে, চার রঙে। মোট পৃষ্ঠা ২০

প্রচ্ছদপট ও ছবি—সুমুখ মিত্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ২, ৩ বা ৪ খানা ছবি।

মুদ্রণকর্ম মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকাশক ও শিল্পী সজ্জাপরিকল্পনা বা রং নির্বাচনে উদাসীন। প্রখর রঙের ব্যবহারে ছবি ও পাঠ্যবস্তু বড় নিষ্প্রভ হোয়ে পড়েছে। বড় ইংরেজী টাইপটির সঙ্গে ছোট ইংরেজী টাইপটির একান্ত মিলের অভাব অপ্রীতিকর। চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি অপরিণত এবং দুর্বল। একথা প্রচ্ছদপট সম্পর্কেও বলা চলে।

প্রশংসাপত্র। চেঙা-বেঙা
মুদ্রক, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা
প্রকাশক, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা

সাইজ: ৭¾ × ৯½ ইঞ্চি। বর্ডারের মধ্যে প্রতি পাতা আগাগোড়া দু'ভাগে বিভক্ত: উপরে ছবি, নীচে আট লাইন কপি ৩০ এম চওড়া। টাইপ ১৪ পয়েণ্ট লাইনো লেডেড। সাদা কার্টিজ কাগজ। দু'রঙা অফসেট কমলা

সিগনেট প্রেসের
পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি পুস্তকের প্রচ্ছদপট।

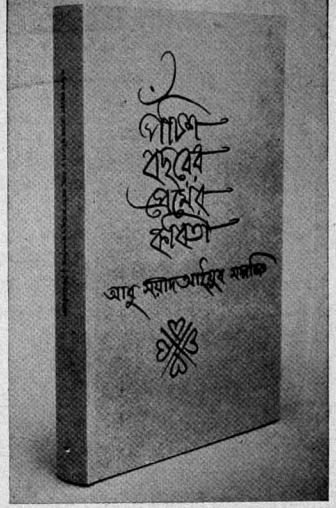

রং ও কালো। মলাট কার্টিজ কাগজে, চার রঙে। মোট পৃষ্ঠা ২২

প্রচ্ছদপট ও ছবি—ধীরেন বল। ২২ খানা কার্টুন পদ্ধতিতে আঁকা ছবি।

ভালো কাগজ, ভালো অফসেট-ছাপা হোলেও চিত্তাকর্ষণে অক্ষম প্রযোজনার একটি দৃষ্টান্ত। পাতার পর পাতা পরিকল্পনার দিক থেকে একইরকম, একঘেয়েমীর কবল থেকে মুক্ত হবার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এমন কি বর্ডারের নিম্নভাগে কুটির, ব্যাঙের ছাতা ও গাছ—এই চিত্রটি ২২ পাতায় ২২ বার মুদ্রিত হয়েছে। কার্টুনঅঙ্কন পদ্ধতিতে শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ পায়নি, যদিও সরল রেখায় শিল্পীর উন্নত ধরনের কার্টুন অন্যত্র দেখেছি। চিত্রে একটি প্রধান চরিত্র ব্যাঙ—তার আকৃতি ও প্রকৃতি নেহাতই দুর্বল।

দ্বিতীয় ধারা। কিশোর সাহিত্য (১০ বছরের উপর)

প্রথম পুরস্কার। অবন পটুয়া
মুদ্রক, নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা
প্রকাশক, শিশু রঙ্‌মহল, কলকাতা

সাইজ: ক্রাউন ১।৪। ৮×৬ ইঞ্চি। দু'কলম ফরম্যাট ৩৬×৪৭ এম। টাইপ পাইকা লেডেড। সাদা কাগজ। টাইপ কালো, ছবি কালো ও লাল রঙে। মলাট আর্ট-পেপার (বোর্ড বাঁধাই) চার রঙে। মোট পৃষ্ঠা ৩৬

প্রচ্ছদপট ও ছবি—সুমুখ মিত্র। রচনাংশে বিভিন্ন আকারে ১৮ খানা ছবি।

প্রকাশন, মুদ্রণ ও অঙ্কনপদ্ধতি (প্রচ্ছদপট-চিত্র বাদে) পরিকল্পনাহীন। লাল ও কালো রঙের গুরুত্ব কাগজ-উপযোগী না-হওয়ায় অনায়াস পাঠের প্রতিকূল। প্রচ্ছদপটে দুর্বল নামাঙ্কন প্রথমেই চোখে পড়ে।

দ্বিতীয় পুরস্কার। ক্ষীরের পুতুল
মুদ্রক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলকাতা
প্রকাশক, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সাইজ: ইম্পিরিয়াল ১।৮। ৭½×৫½ ইঞ্চি। আড়াআড়ি ফরম্যাট ৩০×২১ এম। টাইপ ১৪ পয়েন্ট লাইনো ৬ পয়েন্ট লেডেড। পীতাভ লেড কাগজ। বডি এবং ছবি কালো রঙে। মলাট বাফ্ ম্যানিলা বোর্ডে, গাঢ় লাল ও সবুজ রঙে। মোট পৃষ্ঠা ৮৪

প্রচ্ছদপট—সত্যজিৎ রায়। সমর ঘোষ অঙ্কিত ১৬ খানা পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি।

প্রচলিত খাড়াই আকারের পরিবর্তে আড়াআড়ি ফরম্যাট ব্যবহারে দেশজ পুঁথির ধাঁচে অবনীন্দ্রনাথ লিখিত এই বাংলাদেশের রূপকথায় জাতীয় লক্ষণ পরিস্ফুট। টাইপসেটিঙ অনায়াস পাঠের অনুকূল। শিল্পী সমর ঘোষের উচ্চাঙ্গের রেখাঙ্কনে পূর্ণপৃষ্ঠা টাইপসেটিঙের ভারসাম্য রক্ষিত। প্রথমটি ছাড়া সব ছবিই ফরম্যাটের ডানপাশে মুদ্রিত। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রচনাংশ না-থাকায় ছবির পরিচ্ছন্ন বর্ণপ্রকাশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রকাশ এবং মুদ্রণরূপের এরূপ একটি সুসমঞ্জস মিলনে বাংলা পুস্তক-প্রকাশশিল্পের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হোয়েছে।

প্রশংসাপত্র। আমরা বাঙালী
মুদ্রক, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা
প্রকাশক, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা

সাইজ: ৮½×১১ ইঞ্চি। বাঁদিকের পাতায় পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি, ডানদিকের পাতায় বর্ডারের মধ্যে কপি ৩৬×৫১ এম। টাইপ ১৪ পয়েন্ট লাইনো লেডেড। সাদা কার্টিজ কাগজ। বডি ও ছবি সবুজ রঙে। অফসেটে ছাপা। মলাট কার্টিজ কাগজে, তিন রঙে। মোট পৃষ্ঠা ৩৪

প্রচ্ছদপট ও ছবি—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮ খানা পোর্ট্রেট।

মুদ্রণকর্ম প্রশংসনীয় হোলেও প্রযোজনায় যত্ন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব স্পষ্ট। কপির মতো ছবিও বর্ডার বা ফ্রেমের মধ্যে বসালে আরো শোভন হতো। বরঞ্চ ছবি বর্ডারের মধ্যে সাজিয়ে শিরোনামা সহ দু'কলমে কপি—এই ব্যবস্থা বৈচিত্র্যগুণে উন্নত হতো। শিরোনামার নীচে একটি অলংকারচিত্রও যোগ করা যেত। পোর্ট্রেট অঙ্কনপদ্ধতি শিথিল আকৃতিগত, আরো সবল প্রকৃতিগত হওয়া উচিত ছিল। প্রচ্ছদপটে উপরে ও নীচে দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির ডিজাইন একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হোয়েছে ; নামাঙ্কনে বাঙালীর শ্রী বা চরিত্র অনুপস্থিত।

পঞ্চম ধারা (২) ভারতীয় ভাষায় প্রকাশন

প্রথম পুরস্কার। অন্তরঙ্গ
মুদ্রক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলকাতা
প্রচ্ছদপট মুদ্রক, গসেন এণ্ড কোং, কলকাতা
প্রকাশক, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সাইজ: ক্রাউন ১।৮। ফরম্যাট ১৮×২৬ এম। টাইপ পাইকা লেডেড। শাদা কাগজ। প্রচ্ছদপট ক্রোমো আর্টপেপারে, তিনরঙা—লাল, সবুজ ও গ্রে। বোর্ড বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ১৬০

প্রচ্ছদপট—সত্যজিৎ রায়।

একটি ছোট উপন্যাসের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন সুশ্রী ফরম্যাট—এই গ্রন্থপ্রযোজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরু রেখায় একটি হাত-আয়নাকে নামচিত্ররূপ হিসেবে ব্যবহার করা হোয়েছে, এটিই বড় আকারে নামপত্রের অলঙ্কার, ক্ষুদ্রাকারে পরিচ্ছেদ-শিরোনামা। শ্রীরামপুরের অধর কর্মকার পরিকল্পিত পাইকা টাইপের এমন প্রীতিকর ব্যবহার, সেটিঙ ও ছাপা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদচিত্র ও নামাঙ্কন অভিনব।

দ্বিতীয় পুরস্কার। পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা
মুদ্রক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলকাতা
প্রচ্ছদপট মুদ্রক, গসেন এণ্ড কোং, কলকাতা
প্রকাশক, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সাইজ: মিডিয়ম ১।৮। ফরম্যাট ২৪×৩৮ এম। বডি টাইপ পাইকা লেডেড। কবিতার নাম—স্মলপাইকা বোল্ড। কবির নাম—গ্রেট। সাদা লেইড কাগজ। নামপত্র দুরঙে, ম্যাজেণ্টা লাল ও কালো। গ্রে ম্যানিলা কাগজে মলাট, একরঙে ছাপা—চিক্কণ ম্যাজেণ্টা লাল। স্পাইন মেরুন রেক্সিন, সোনালী টাইপ। জ্যাকেট—গ্রে ম্যানিলা কাগজ, মলাটের মতো একরঙে ছাপা। মোট পৃষ্ঠা ২২৪

প্রচ্ছদপট—সত্যজিৎ রায়।

এমন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় কবিতা সংকলনগ্রন্থের প্রকাশ বাংলাভাষায় বোধ হয় প্রথম। টাইপসেটিঙ বা কবিতা সাজানোর ব্যবস্থায়, প্রচ্ছদপট বা কাগজ নির্বাচনে, ভূমিকার কোটেশন বা দুই কবিতার মাঝে ক্ষুদ্র একটি বর্ডার ব্যবহারে—গ্রন্থপ্রযোজনার সর্বক্ষেত্রে এমন যত্ন ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বিরল। শুধু নামাঙ্কনে প্রচ্ছদপট গ্রন্থচরিত্র যে কতখানি বজায় রাখতে পারে বা চিত্তাকর্ষক হোতে পারে —এই গ্রন্থ তার দৃষ্টান্ত। ভিতরের মলাটে ও নামপত্রে কালীঘাটের বিখ্যাত পট গোলাপসুন্দরীর ব্যবহার প্রীতিকর। মুদ্রণকর্মে কালির ইম্প্রেশন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সমান হয়নি, পাইকা টাইপে আরো হালকা ইম্প্রেশন অনায়াস পাঠের অনুকূল। কবিদের নাম সেটিঙে গ্রেট টাইপ ব্যবহার না কোরে অপেক্ষাকৃত ছোট টাইপ ব্যবহার কোরলে ভালো হতো।

প্রশংসাপত্র। চার দেয়াল
মুদ্রক, নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা
প্রকাশক, নাভানা, কলকাতা

সাইজ: ক্রাউন ১।৮। ফরম্যাট ২২×৩৩ এম। টাইপ স্মলপাইকা লেডেড। শাদা কাগজ। মলাট হলুদ কাগজে, তিন রঙে—বাদামী, নীল ও কালো। বোর্ড বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ২৪০

প্রচ্ছদপট—রণেন মুখোপাধ্যায়।

বিশেষত্বহীন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণকর্ম, যা কিছু আকর্ষণ মলাটে। অঙ্কনে শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু গ্রন্থ-চরিত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কেন কল্কাচিত্রিত শাড়ির অঞ্চল ? অন্তত কল্কাগুলিও তো তিনটি না হোয়ে চারটি হতে পারতো!

ষষ্ঠ ধারা। ভারতীয় কাগজে গ্রন্থপ্রকাশন

প্রথম পুরস্কার। এলেম নতুন দেশে
মুদ্রক, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা
প্রকাশক, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সাইজ: মিডিয়ম ১।৮। ফরম্যাট ২২×৩৬ এম। বডি-টাইপ লাইনো ১২ পয়েন্ট অন ১৪ পয়েন্ট। ক্রিম লেড কাগজ। মলাট হালকা গ্রে কাগজে, দু'রঙে—বাদামী ও গ্রে। বোর্ড বাঁধাই। গ্রন্থশেষে ২০ পৃষ্ঠা আর্ট-ইন-সেট, ২৩ খানা শাদা-কালো হাফটোন ব্লক। মোট পৃষ্ঠা ১৫২

প্রচ্ছদপট—সত্যজিৎ রায়।

পরমপ্রীতিকর ফরম্যাট, উচ্চাঙ্গের টাইপসেটিঙ ও ইম্‌প্রেশন। কাগজের সঙ্গে কালির এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার সহজে চোখে পড়ে না। পরিচ্ছেদ-শিরোনামায় আশাতীত অথচ অব্যর্থ ছোট টাইপের ব্যবহার, কোটেশন, গান বা গানের ছক, সেটিঙে টাইপব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রন্থগঠনের যাবতীয় বিভাগে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হোয়েছে তা প্রকাশকের নিজস্ব। আর্ট-ইন-সেটে হাফটোন ব্লকমেকিং প্রথম শ্রেণীর; মুদ্রণ ও সাজানোর পদ্ধতিও প্রশংসনীয়।

এই প্রবন্ধের প্রথম পাতায় প্রকাশিত—পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ফোক্ টয়েজ অব ইণ্ডিয়া'র প্রচ্ছদটি ইংরাজি হোলেও ছাপা হোয়েছে—তার কারণ, পুস্তকটি বাংলা দেশ হোতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত—সম্পাদক।

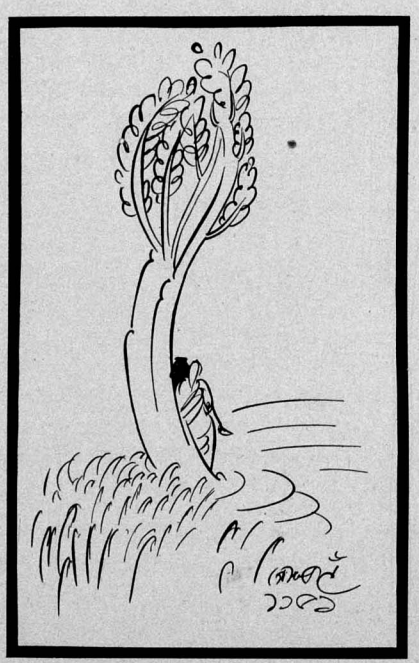

। শিল্পী গোপাল ঘোষ অঙ্কিত একটি রেখা-চিত্র।

ফুলের পাপ্‌ড়ির মত পাত্‌লা
—কাঁচের ঠুন্‌কো গেলাস—
। টুং। টাং। টুং।
কি মিষ্টি আওয়াজ!
—বার বার টোক্‌না মেরে
বাজাই সেটাকে।

—বাঃ কি মিষ্টি সুর—
। টুং। টাং। টুং।

সেতারের তারে ঘা মারার মত—
পিওনোর চাবিতে টোকা মারার মত—
। টুং। টাং। টুং।
—বাঃ কি মিষ্টি সুর।

! ঝন্‌-ঝন্‌-ঝনৎকার !

ভাঙল নিমেষে।
চুর্‌-চুর্‌-চমৎকার!

—জাগ্‌লো ঝঙ্কার—
সেতারের তারে 'ঝালা' দেওয়ার মতো।
—যেন পিওনোর পিঠে পোল্‌কা নাচের ঝড়।

সব শেষ।
…তবু শেষ হয় কি জীবনের গৎ?

একটি অজ্ঞাতনামা চেক্ কবির অনুকরণে

বোহেমিয়ান কাঁচের অতীত এবং বর্তমান

কথায় বলে, কাঁচের মতো ভঙ্গুর। কিন্তু এই আপাততুচ্ছ ভঙ্গুর জিনিষও যে একটি উৎকৃষ্ট শিল্প হোতে পারে, দেশ বিদেশের কাঁচদ্রব্যে তা সপ্রমাণ। সুখের কথা, এই শিল্পে ভারত আজ আর পেছিয়ে নেই, কিন্তু এখনো এই শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার কোরে আছে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ছোট দেশ। বস্তুত অতীতের মতো বর্তমান সময়েও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাঁচই প্রধান। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচের বাজার ছড়িয়ে। নক্‌শা-করা, অথবা রঙীন কাঁচের জন্য এই দেশটি অন্যান্য দেশের কাছে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন এর আমদানীর ব্যাবসা উল্লিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। কাঁচের পাত্র এবং বোতলের ব্যাবসাতেও এই দেশ এখন বিশিষ্ট হোয়ে উঠেছে। বিশেষ কোরে পানপাত্র হিসেবে জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, ইতালী ও অন্যান্য দেশে চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচের কদর বেড়েছে এবং বিক্রীও বেড়েছে অনেক পরিমাণে। তাছাড়া এই সব দেশে বাতিদান ও আলোর ঝাড়ের সাজ-সরঞ্জামের কারখানা যাদের আছে, নক্‌শা ও উপযুক্ত সংস্থাপনার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পীরাও সহযোগিতা কোরছেন। আর এই শিল্পীরা বিশেষ কোরে আলোর সাজ-সরঞ্জামের নক্‌শা প্রস্তুতে শিক্ষিত ও পারদর্শী।

এই সহযোগিতার ফলে আলোর আধুনিক সংস্থাপন ব্যবস্থার সৃষ্টি হোয়েছে। এবং এই আধুনিক রীতিটি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের আলোকসজ্জা ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত কোরেছে। বর্তমানে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাড়ী তৈরীর কাঁচ ও কাঁচের পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক গৃহনির্মাণ ব্যাপারে এই কাঁচ এক বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। গত উনিশ শতক থেকে চেক্ কাঁচ ব্যবসায়ীরা ল্যাবরেটারি ও টেকনিক্যাল কাঁচ সরবরাহের জন্য বিখ্যাত। কাভালিয়ের কাঁচ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতির মূলে ছিল কেমিক্যাল ও হিট-রেজিষ্ট্যাণ্ট কাঁচ প্রস্তুত। আধুনিক করার ফলে গত বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি নানা নতুন ধরনের কাঁচ প্রস্তুত কোরেছে। হিট-রেজিষ্ট্যাণ্ট সিম্যাকস ও সিগাল কাঁচ গুণের দিক থেকে জার্মানীর ডুরাণ এবং রসোথার্ম কাঁচ অথবা আমেরিকার পাইরেক্স কাঁচের সমতুল্য। এতকাল চেকোশ্লোভাকিয়ায় চশমার কাঁচ তৈরীর ব্যবস্থা ছিল না। এখন তাও হোয়েছে।

আধুনিককালে কাঁচশিল্পে এই অগ্রগতি সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে হস্তশিল্পই এখনও তার ঐতিহ্যগত খ্যাতি বজায় রেখেছে। কাটলিও গ্লাসের তৈরীর ব্যাপারে এই দেশ নানা নতুন ধরনের প্রয়োগ কোরেছে। এই বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান হোয়েছে একদিকের ঐতিহ্য অনুসারী সমৃদ্ধ বোহেমিয়ান কাঁচের মাধ্যমে ও অন্যদিকে আধুনিক রুচির প্রয়োগে। নক্‌শা-খচিত চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচ বিদেশীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন কোরেছে। কাঁচের ওপর নক্‌শা খচিত করার কৌশলে এদেশ এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। —**প্রভাত রায়।**

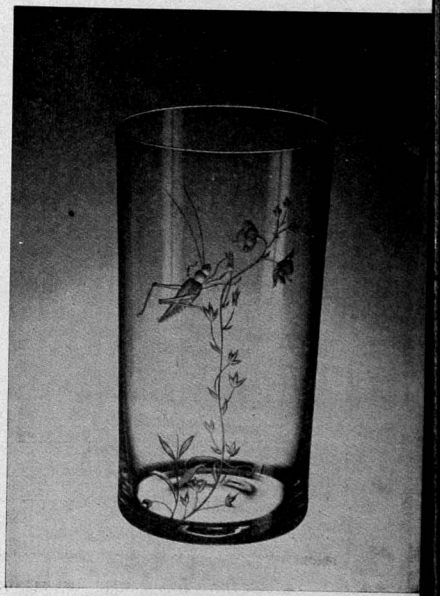

খবরাখবর

প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি প্যারিসের 'ইণ্টারন্যাশানাল এসোসিয়েশন অব আর্ট

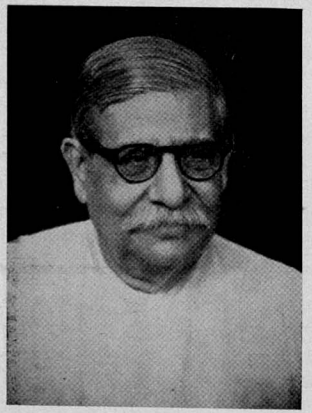

ক্রিটিকস' নামক সংস্থার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হোয়েছেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রাজ্ঞ শিল্প-সমালোচকের এই নির্বাচনে আমরা একান্তই আনন্দিত হোয়েছি।

সম্প্রতি শ্রুতকীর্তি শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর জন্মোৎসব হোয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে তাঁর কোলকাতার বাড়ীতে বহু সারস্বতজনের সমাগম ঘটেছিল। আমরা শ্রীযুক্ত বসুর দীর্ঘজীবন কামনা কোরছি।

সম্প্রতি ভারত সরকার নন্দলাল বসুর শিল্পীজীবন চলচ্চিত্রে রূপায়িত কোরতে অগ্রণী হোয়েছেন। এই দুরূহ দায়িত্ব অর্পিত হোয়েছে তরুণ বাংলার অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী সত্যজিৎ-এর উপর। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র সার্থক চিত্র-রূপকার সত্যজিৎবাবুর আগামী সৃষ্টির সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

নন্দলালের জীবনকর্ম চিত্রে রূপায়িত করা ছাড়াও সত্যজিৎ রায় তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প 'জলসাঘর'-এর চিত্ররূপ দেবার আয়োজন কোরছেন বোলে শোনা গেল। বাংলা চলচ্চিত্রজগতের একমাত্র গর্ব ও আশা শ্রীযুক্ত রায়ের এই প্রচেষ্টাও সার্থক হোক, এই কামনা কোরছি।

নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ললিতকলা আকাদেমী প্রযোজিত বৌদ্ধ শিল্পপ্রদর্শনীতে সিংহল, ব্রহ্ম ও ইন্দো-

নেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বাম থেকে দক্ষিণে: বন্দরনায়েক, উ ব সিউ এবং ডক্টর আলি শাস্ত্রমিদজোজোকে দেখা যাচ্ছে।

নয়াদিল্লীর বৌদ্ধ শিল্পপ্রদর্শনীতে কাম্বোডিয়ার যুবরাজ নোরোদোম সিহনৌক। এই শিল্প-প্রদর্শনীর 'চীনা বিভাগে' তিনি কতকগুলি 'মুরাল চিত্র' দর্শনরত।

বাঙালী প্রতিভার সাযুজ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ অনেকদূর অগ্রসর হোতে পেরেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অধুনা কিছু কিছু সৎ ও মহৎ প্রচেষ্টার মুখদর্শন সম্ভব হোয়েছে বাঙালীদের জন্যই। এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ শ্রীবিমল রায় পরিচালিত 'গোতম দি বুদ্ধ'। ভারত সরকারের সহযোগিতায় প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে গৌতমবুদ্ধের জীবনী চলচ্চিত্রে রূপায়ন করার অভিনব ও মহৎ প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে শ্রীযুক্ত রায় শিল্পানুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হোয়েছেন।

দুরূহ কিছু সম্পাদনের ক্ষমতা এখনো যদি কারো থাকে, তবে তা বাঙালীদের। এমনি এক দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন কোরেছেন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সংস্কৃতির ইতিবৃত্তকার শ্রীবিনয় ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ মূল্যবান তথ্যাদি এই বৃহৎ গ্রন্থের ভিত্তিভূমি। গ্রাম-বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস আলোচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ রচনা কোরে শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হোয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক উদ্বোধিত নয়াদিল্লীর এই শিল্প-প্রদর্শনীতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং এবং উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ অভয়মুদ্রায় দণ্ডায়মান একটি বুদ্ধমূর্তি দেখছেন।

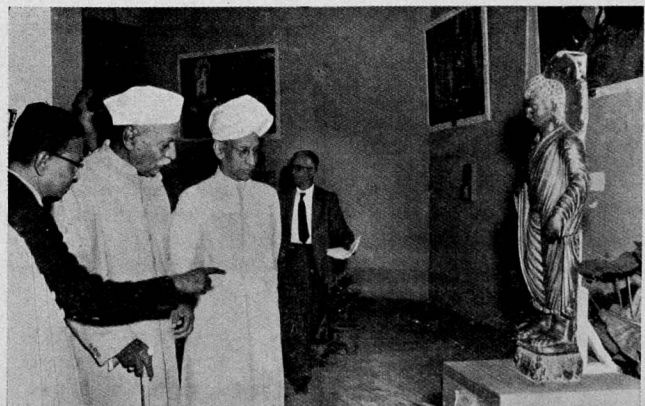

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'হস্তশিল্প সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হোয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোয়েছিল। বাংলার হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রদর্শনী হিসেবে এটি সত্যই উল্লেখনীয়। হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে সরকারের উদ্যমকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

কিছুদিন পূর্বে 'নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা'র সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় কোলকাতায় এসেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের নানা সংগীত-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট বাদ্যভবন-এর অনুকরণে তিনি কোলকাতায় হস্তশিল্প সংস্থার আনুকূল্যে একটি বাদ্যভবন সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ কোরেছেন। পাথুরিয়াঘাটার খ্যাতিমান সংগীতকলা পৃষ্ঠপোষক শ্রীমন্মথ ঘোষের সঙ্গে এই বাদ্যভবন গঠন সম্পর্কে তিনি প্রাথমিক কথাবার্তা বোলেছেন।

সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত 'হস্তশিল্প প্রদর্শনী'তে ভারতীয় হস্তশিল্প সংস্থার প্রতিনিধিত্ব কোরেছিলেন শ্রীমতী বীণা দাশ। শ্রীমতী বীণা দাশের বড় পরিচয় তিনি উদয়ভিলা উদ্বাস্তু সমিতির সুযোগ্য সম্পাদিকা। তাঁর অসীম কর্মক্ষমতা ও শিল্পানুরাগের ফলে উদয়ভিলার উদ্বাস্তু সমিতি আজ একটি অগ্রণী শিল্প-প্রতিষ্ঠান হোয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উল্লেখ্য শিল্প-প্রদর্শনীতে শ্রীমতী দাশের মতো উপযুক্ত কর্মী ও শিল্পানুরাগীর প্রতিনিধিত্বে আমরা বিশেষ আনন্দলাভ কোরেছি।

কোলকাতা সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হোয়ে গেল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব কোরেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মল কুমার সিদ্ধান্ত। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর এই উৎসবে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দিয়েছিলেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে দেশের শ্রদ্ধেয় কয়েকজন মনীষীকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হোয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা সংবাদপত্রে শ্রীশিশির ভাদুড়ীকে এই সাম্মানিক উপাধি দেওয়া হবে দেখেছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও গুণীজন-স্বীকৃতির সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যে শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর ভাগ্যে এই সম্মানলাভ ঘটে ওঠেনি। শুনেছি, শিশিরবাবুকে এই সম্মানদানের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ তাঁর নটজীবনের উল্লেখ করা হোয়েছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যসাহিত্য উচ্চতর শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত, সেখানে একজন প্রতিভাশালী নাট্যসাহিত্যের সাধককে সম্মান প্রদর্শনে কি আপত্তি থাকতে পারে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধি বিশেষই বোলতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন আগে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় বৃটেনের খ্যাতিমান মঞ্চাভিনেতা লুই ক্যাসনকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত কোরেছিল। শতবর্ষ অতিক্রম কোরেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো কি অপরিণতবয়স্কই রয়ে গেল?

সম্প্রতি দিল্লীতে এশিয়ার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলন হোয়ে গেল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমাগমে এজাতীয় সার্থক সম্মেলনের জন্য উদ্যোক্তাদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই, এ-সম্মেলনে সভাপতিত্ব কোরেছিলেন জনাব হুমায়ুন কবির। এশিয়ার সাহিত্য-সম্মেলনে বাঙালী মনীষার সভাপতিত্ব করার জন্য আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

কিছুদিন আগে দিল্লীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে ইউনেস্কোর অধিবেশন হোয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রযোজিত বৌদ্ধ শিল্পের প্রদর্শনীর উল্লেখ কোরতে হয়। দেশবিদেশের বৌদ্ধ শিল্পকীর্তি এতে স্থানলাভ কোরেছিল। এই শিল্প-প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অধিবেশনে দেশ-বিদেশের বহু বরেণ্য মনীষী ও জননেতার সমাগম হোয়েছিল। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ ভারতবর্ষ যে অগ্রণী দেশসমূহের অন্যতম, এই অধিবেশনে তা সপ্রমাণ হলো।

The skill of Krishnagar craftsmen is hereditary, their technique simple, and their materials and implements cheap. Yet each toy or model made of clay, straw and rags—and brilliant colours, is a piece of art. The prices are moderate. They deserve a place in every home. It will be an excellent addition to a connoisseur's collection, to the beauty of any house and to the delight of all children : the Krishnagar toys and models.

ISSUED BY THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL

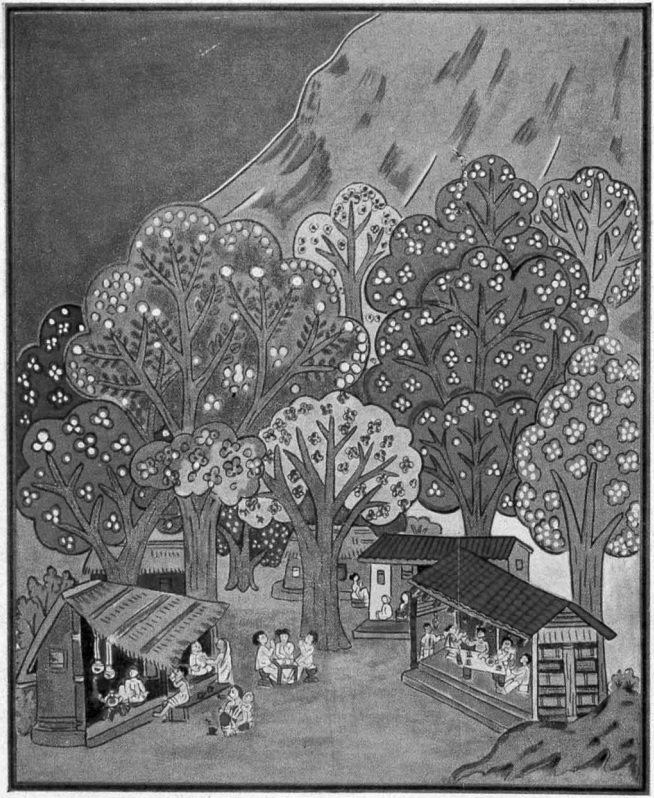

INDIAN ART USED IN ADVERTISING

BURMAH-SHELL ●●● IN INDIA'S LIFE AND PART OF IT

INDIAN ART USED IN ADVERTISING

BURMAH-SHELL ●●● IN INDIA'S LIFE AND PART OF IT